‘হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ’

বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
ঔপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
Hetha Arjo, Hetha Onarrjo: Uponibesh Dokhole Arrzotottwer Bhumika O Vodrobitt Brahmo Somaj
বিশ্বেন্দু নন্দ

রাজপরিবারের সব ছবি Lafayette Studio Archive of the V&A, London - http://www.rvondeh.dircon.co.uk/cooch2.html
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি কোচবিহারের মহারাণী অসবোর্ন হাউসের দরবার করিডোরে, ১৮৮৭

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।।*
গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

সম্পাদকমণ্ডলী বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ রায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, সাজাহান আলি, ইমরাজ শেখ মির্জা

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, হিন্দমোটর, হগলী

দাম ১০০ টাকা
কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

> “শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
> মুছে দেবো আদ্যক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।
> বাঙালী কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী
> জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী।”
>
> - আল মাহমুদ

জ্ঞানগঞ্জের এই পুস্তিকা মূলত তিনধারার রাজনৈতিক নির্মাণকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। প্রথমত, এই প্রকল্পনায় প্রাচ্যবিদ ম্যাক্সমুলারের অতিরঞ্জিত ভাববিগ্রহের সম্পূর্ণ অবিনির্মাণ ঘটানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্ম থেকে বাম হয়ে রামভক্তে রূপান্তরিত বাঙালি ভদ্রবিত্তদের বিশুদ্ধ ‘আর্য’রক্ত ও ঔপনিবেশিক জাতিতত্ত্বের প্রতি অনুরাগের ঐতিহাসিক পারম্পর্য চিহ্নিত হয়েছে। তৃতীয়ত, জ্ঞানগঞ্জ দলের দীর্ঘদিনের আগ্রহের বিষয়, ঔপনিবেশিক কালখন্ডে আইনি বিবাহকে সামাজিক-পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার অবলম্বন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করায় মুখ্য ভূমিকা রাখা নবজাগরণী সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিতর্কিত বিবাহ-ঘটনাটির মাধ্যমে পরম্পরাগত ‘কোডে’র ভূয়া খামচাখামচি দিয়ে গড়া দমনমূলক ‘কলোনিয়াল লিগ্যালিটি’র আলোচনায় খানিক নথিবদ্ধ হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আগামীতে চর্চাদল প্রকাশ করবে।

ভারতীয় হিন্দুত্বের আন্তর্জাতিক প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ, খোদ নিজেই শংসাপত্র দিয়েছিলেন ‘মোক্ষমুলার’ সাহেবকে। জানিয়েছিলেন ‘ম্যাক্সমুলার ইজ আ বেদান্তিস্ট অফ বেদান্তিস্টস’।

এই ম্যাক্সমুলার প্রণীত আর্যতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তার ‘উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড’ গ্রন্থে লিখছেন- ‘একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, ইতিহাসের আদি পৃষ্ঠায় আমাদের অস্তিত্ব একটি প্রগতিশীল এবং অত্যন্ত সভ্য জাতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে - তৎকালীন বিশ্বের একমাত্র জাতি, এক ও একমাত্র হিন্দুদের এই ভূখণ্ড, যেটি হিন্দুস্থান নামে পরিচিত হয়েছিল।’ এই বিশুদ্ধ রক্তের সন্ধানকারী তত্ত্বে তিনি টেনে আনছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আরেক জনক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রচিত ‘দি আর্কটিক হোম ইন দ্য বেদাজ’ গ্রন্থটিকে। এসব জাতিবাদী, পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত রাজনৈতিক তত্ত্বায়নের মূলাধার ম্যাক্সমুলার সাহেব ও তার ‘অভ্রান্ত’ বেদ তথা সংস্কৃত চর্চাকে প্রমাণসহ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এই পুস্তিকার লেখক।

আচমকা আবিষ্কৃত ও পুনর্জীবিত হওয়া প্রাচীনতম সংস্কৃত টেক্সটগুলির ম্যাক্সমুলার-

কৃত অনুবাদের সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠা এবং আর্য-আগমনের তত্ত্ব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা রীতিমতো অর্থানুকূল্য লাভ করেছিল। যে কারণে লর্ড কার্জন এই তত্ত্বের স্তুতিতে বললেন - 'দি নেসেসারি ফার্নিচার অফ এম্পায়ার' এবং আর্যতত্ত্ব বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করলো ম্যাক্সমুলার এবং কেশবচন্দ্র সেনের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এইভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলত সফটওয়ার, কিছুটা হার্ডওয়্যার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করবে ব্রাহ্মসমাজের মত সাম্রাজ্যবাদের কোলাবোরেটররা। এই পুস্তিকার লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে ঘটনাক্রমকে সামনে এনেছেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ, ব্রাহ্মসমাজের বিভাজনের মত ঘটনাকেও তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত করেছেন।

কেশব সেন কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের বিবাহ (৬ই মার্চ, ১৮৭৮) ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে 'বৈবাহিকতা'র ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথাপি বিতর্কিত উপাদান। যেখানে এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্র সেনের নৈতিক-কাঠামোর অধঃপতন, ব্রিটিশদের দ্বারা প্রণীত সিভিল ম্যারেজ ল' এবং ব্রাহ্ম-পরিবারের মূল্যবোধে আচার-বিচারের দ্বন্দ্ব। সুনীতি দেবী তার আত্মজীবনী 'দি অটোবায়োগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস' গ্রন্থে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, কীভাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ডালটন এবং অধিনস্থ ইংরেজ আমলা দল, যাদের তৈরী আইনে নাকি বিবাহের সম্মতিতে নারীর নিজস্ব অধিকারের কথা বলবে, তারাই প্রতিনিয়ত কেশবচন্দ্র সেনকে চিঠি লিখে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করাতে বাধ্য করছেন। এবং সাম্রাজ্যবন্ধু কেশবচন্দ্র সেন, সেটি ঘটালেনও। বাবার এহেন আচরণের বিরুদ্ধে সুনীতি দেবীর আত্মজীবনী যথেষ্ট উষ্মাই প্রকাশ করেছে। সম্পত্তির অধিকার ও নারী ক্ষমতায়নের 'ইউরোপীয়' বুলির ফানুস ফাটানোর জন্য এই ঘটনাক্রমের একটি উপনিবেশবিরোধী বয়ান এই পুস্তিকায় নথিবদ্ধ হল।

রবীন্দ্র ভাবনায় 'শক হুণ পাঠান মোগল' জাতিসমূহের মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আজকের তথাকথিত ভারত ভূখণ্ডে অভিবাসনে বৈশ্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরাও মনে করি মানব সভ্যতার ইতিহাস, মানুষের এক ভূখণ্ড থেকে আরেক ভূখণ্ডে বারংবারের অভিবাসন-গাথা। কিন্তু আর্যতত্ত্বের ব্রিটিশ ও উপনিবেশিক নির্মাণ এই সহজাত মানব প্রবৃত্তিকে জাতিবিদ্বেষের রাজনীতির সূচনাপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। এর ওপর ভর করেই আজকের ভারতে তথাকথিত নাগরিকত্ব প্রদানের ফ্যাসিবাদী প্রকল্প রচিত হচ্ছে, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন বিরোধী জনপ্রিয় জাতিবিদ্বেষী তত্ত্বের নির্মান চলছে।

সব মিলিয়ে, জ্ঞানগঞ্জের অষ্টম পুঁথি ও উপনিবেশ বিরোধী কর্পোরেট বিরোধী চর্চাদলের অবিরত আলাপের আরেকটি নিদর্শন আপনাদের, পাঠক সমীপে উপস্থিত করা হল।

ধন্যবাদান্তে,

অত্রি ভট্টাচার্য

উপনিবেশ, আর্য অভিবাসন তত্ত্ব এবং কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘটকালি, উপনিবেশিক সভ্যতা বিস্তার প্রকল্প

বিশ্বেন্দু নন্দ

দক্ষিণ এশিয় সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটা লুঠ, খুন, অত্যাচার, গণহত্যা, বিশিল্পায়নের নীতি, ম্যাক্সমুলারের ব্রিটিশ আর্যতত্ত্ব হাতিয়ার করে উপনিবেশপূর্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-কৃষ্টি কাঠামো ধ্বংস করে সাম্রাজ্য নিগড় পোক্ত করার নীতি, প্যাক্স ব্রিটানিকার অধিকাংশ শর্ত ভদ্রবিত্ত সমাজ আর অভিজাত দরবারে মানতে বাধ্য করার নীতি বাঙালি কোলাবরেটর ভদ্রবিত্ত কোনও প্রশ্ন ছাড়াই পরম শ্রদ্ধায় নিজের জীবন দিয়ে সিপাহি স্বাধীনতা সংগ্রামের আশেপাশের কয়েক দশক সফলভাবে প্রয়োগ করার ছোট্ট প্রেক্ষিতের বয়ান আমরা জ্ঞানগঞ্জের আট নম্বর পুথিতে উপস্থিত করব। সুলতানি আমলে বাঙালি ভদ্রবিত্ত গোস্বামী ভাইরা রাষ্ট্র-থাকবন্দীর প্রধানতম দুই মন্ত্রীত্ব পদ অর্জন করলেও মাথায় রাখতে হবে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিটা শর্ত মেনে আত্মনিবেদনে প্রস্তুত বাঙালি কোলাবরেটর ভদ্রবিত্ত, সিপাহি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১০০ বছরের উপনিবেশিক সময় পর্যন্ত খুব বেশি হলে প্রশাসনিক থাকবন্দীর মাঝারিস্তরের ডেপুটিগিরির চাকরিতে সন্তুষ্ট হয়েই আপ্রাণ সাম্রাজ্য উপাসনায়

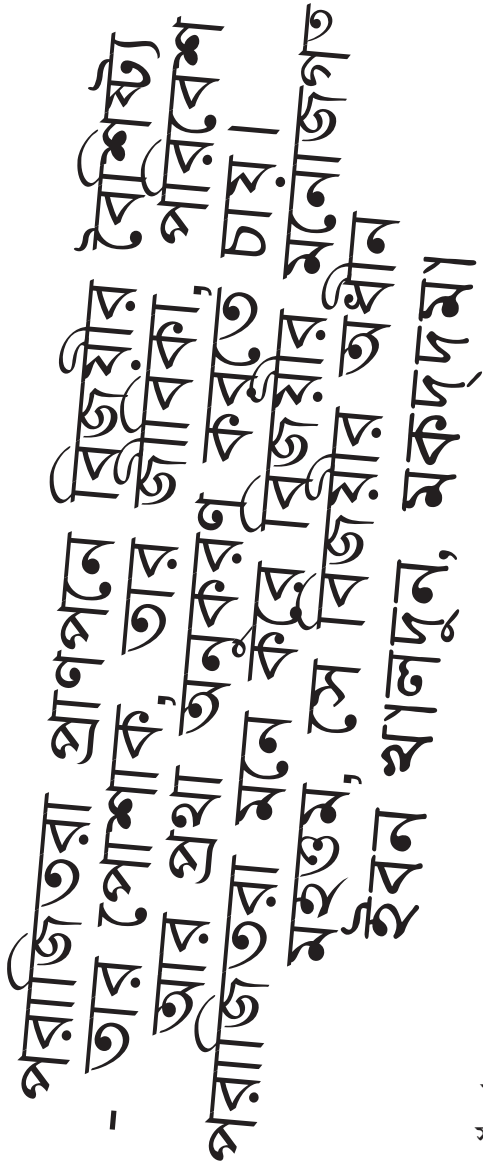

ব্যস্ত থেকেছে। সিপাহি যুদ্ধের কথা যখনই উঠল, মূল আলোচনা আলোচনা শুরু করার আগে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করব - ডান, বাম উভয় পক্ষই সিপাহি যুদ্ধকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার লড়াই আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু ১৭৫৭র পলাশী উত্তর সময় থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত লড়াই স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে অভিহিত হয় নি। অথচ প্রত্যেকটি লড়াইতে গ্রামীণেরা অস্ত্র হাতে প্রাণবাজি রেখে রাস্তায় নেমেছেন লুঠেরা খুনি গণহত্যায় হাত রাঙানো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। কেন হকার-কারিগর-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষের লড়াইগুলোকে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিচ্ছি, কেন সেই লড়াইগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসকারেরা স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেন না সে আলোচনা এই প্রবন্ধে তুলছি না - বারান্তরে কোনও দিন হবে, প্রশ্ন রেখে গেলাম।

১৭৬৩র ফকির সন্ন্যাসী থেকে শুরু হওয়া হাজারো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইএর ধারাবাহিকতা মিলল ১৮৫৭র দেশজোড়া যুদ্ধে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আগ্রাসনে রাষ্ট্রহীন সাম্রাজ্য অনুগত শিখ আর গোর্খা বাহিনীর ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতে সিপাহি স্বাধীনতা যুদ্ধ উতরে গেলেও, উপনিবেশ পরিচালকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পায়ের তলার মাটি তখনও শক্ত নয়। ১০০ বছরের প্রখর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ দমনের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ এশিয়ার লুঠ করা সম্পদে ভর দিয়ে আরও বড় উপনিবেশ তৈরির কাজে নামবে তার উপনিবেশিক প্যাক্স ব্রিটানিকার নীতি বিস্তারের যুক্তি মাথায় নিয়ে নিত্য নতুন কোলাবরেটর তৈরির চেষ্টায়, সাম্রাজ্যতাত্ত্বিক ট্রেভলিয়ন, মেকলে, মুলারের তৈরি করা সাম্রাজ্য জ্ঞানকাণ্ড ভিত্তি করে। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্যে যে আরও

সক্রিয়, অনুগামী ভদ্রবিত্ত কোলাবরেটর দরকার, এই তত্ত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

উপনিবেশের শুরুর সময় থেকেই অভিজাত ভদ্রবিত্ত কোলাবরেটরে গোষ্ঠী লুঠেরা গণহত্যাকারী সাম্রাজ্যের সক্রিয় সঙ্গী ছিল সে কথা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন আখ্যান 'পার্টনার ইন এম্পায়ার'এ বলেছেন ব্লেয়ার বি ক্লিং। একই ইঙ্গিত আমরা দেখি সাম্রাজ্যের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার কারিগরি ব্যবস্থার বিশিল্পায়নে ভদ্রবিত্তদের সক্রিয় অংশ নেওয়া, কর্পোরেট বাস্তুতন্ত্র চালানোর সহায়ক হওয়া। সিপাহি যুদ্ধের আঁচ নিভতে না নিভতেই ১৮৬৪তে ঠাকুর পরিবার উপনিবেশকে উপহার দেবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আইসিএস। ১৮৭১এ সাম্রাজ্য সেবায় আইসিএস রাজপুরুষ উপহার দেবে কলকাতার রামবাগানের জমিদার পরিবার। অবসরের পর তিনি 'সভ্য' লন্ডনে থেকে গেলেও তাঁরই তত্ত্বায়নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠের বাখান হাট করে খুলবে, লুঠ শব্দ ব্রিটিশ অভিধানে ঠাঁই পাবে।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখব কোন রসায়নে ১৮৫৭র যুদ্ধের পর আরেক কোলাবরেটর পরিবারের প্রখ্যাততম নবজাগরণী, দেওয়ান এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম দক্ষিণ এশিয় সেক্রেটারি রামকমকল সেনের নাতি, ব্রাহ্ম-বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর্যতত্ত্ব নির্ভর আগ্রাসী প্যাক্স ব্রিটানিকার উপনিবেশিকতা প্রসারে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভদ্রবিত্ত সমাজে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সম্বল করে কেশবচন্দ্র যেমন অনুগামী ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রবিত্ত বাঙালির চাকরি, দালালি, উঞ্ছবৃত্তি নিশ্চিত ক'রে ভদ্রবিত্ত সমাজের সাম্রাজ্যস্তুতি, আত্মনিবেদনী দাস্যভাব প্রকাশের মূর্ত প্রতিনিধি হবেন, অন্যদিকে তার উত্তুঙ্গ খ্যাতি ব্যবহার করে সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠকর্ম আরও জোরদার ঘণবদ্ধ হবে, বাংলায় প্যাক্স ব্রিটানিকার সরব প্রবেশ ঘটাবে মুঘল যুগে গড়ে ওঠা বাংলার এক আদিবাসী কৃষ্টিভিত্তিক রাজপরিবারে। তাঁর জনপ্রিয় কাঁধে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ব্রাহ্ম কাঠামো ভিত্তি করে সামাজিক সংস্কারের প্রচার-প্রসার আর প্যাক্স ব্রিটানিকা নীতির বীজ রোপন করেছে বলেই তার প্রগলভতাকেও সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু মাথায় রাখতে হবে শেষ বয়সে প্যাক্স ব্রিটানিকা অস্ত্রেই তার জনপ্রিয়তা ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে উপনিবেশিক প্রশাসন।

তবে ঠাকুর, দত্ত, সেনেদের মত সাম্রাজ্য থেকে প্রত্যক্ষ্য উপকার পাওয়া জমিদার-অভিজাতই নয় আমভদ্রবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও দেশজুড়ে কর্পোরেট ইকোসিস্টেম অর্থাৎ পশ্চিমি মতে কেন্দ্রিভূত কর্পোরেরট ব্যবসা, উৎপাদন, শিক্ষা, পরিবহন, বিচার ব্যবস্থা, দালালি প্রশাসনের থাকবন্দীর নিচুতলা থেকে মধ্যক্ষেত্র

তীব্রভাবে দখল করবে মুসলমান সমাজের ভদ্রবিত্তকে চাকরি, লেখাপড়া, রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রায় উচ্ছেদ করে। আর্যভূমি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাচ্যবাদের অক্ষহৃদয় যদি হয় হিন্দুআধিপত্যবাদ, তাহলে মৌলভাবে প্রাচ্যবাদী হিন্দুত্ববাদী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নুনে পালিত ভদ্রবিত্ত ছানাদের প্রয়োজন ছিল সংগঠিতভাবে সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যতত্ত্বের, সাম্রাজ্য প্রধানের গুণ গাওয়ার কাঠামো তৈরি করা, উপনিবেশ স্তুতির সঙ্গে উপনিবেশপূর্ব সময়ের অখ্যাতির বাখান উপস্থাপন করা।

আমরা দেখব কেন, সিপাহি উপপ্লবের কয়েক বছর আগে মেকলের ভাষায় ব্রিটিশদের থেকেও বেশি ব্রিটিশ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজদের সমকক্ষ হতে চাওয়ায় বেথুনের প্রবল মুখঝামটায় ইংরেজিতে কাব্য লেখার কেরিয়ার ছেড়ে বাংলা ভাষা সেবায় প্রবেশ করতে বাধ্য হবেন, আর সিপাহি যুদ্ধের দু'দশক পরে ১৮৭৭এর মার্চ কেশবচন্দ্র সেন উপনিবেশিক শাসক আর উপনিবেশিত প্রজাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে লন্ডনে দাঁড়িয়ে স্পর্ধিতভাবে 'আমরা প্রাচীন আর্য জাতির দুটি ভিন্ন পরিবারের বংশধর, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তুতো ভাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আমাদের দুই হাত মিলিয়ে দিল' বললেও তাকে গালি না দিয়ে তুমুল প্রচার দেবে সাম্রাজ্যবাদের সংবাদমাধ্যম।

কোম্পানি আমল থেকেই প্রত্যেক প্রখ্যাত নবজাগরণীর পেশাদারি, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক জনজীবন শুরু হয়েছে কোম্পানির উপনিবেশে চাকরি, দালালি, উমদোরি আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত লুঠ উদ্বৃত্ত নির্ভর চক্ষুলজ্জাহীন স্তুতিবাদী চাটুপটু লেখা মকশ করে। ১৮৫৭য় প্রখ্যাত নবজাগরণীদের গুরুস্থানীয় কবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের লজ্জে দেশজোড়া 'প্যাঁজ খোর নেড়ে'রা রাস্তায় নেমে বিপ্লব শুরু করায় সাম্রাজ্যপুষ্ট নবজাগরণীরা সাম্রাজ্য বিলয়ের চিন্তায় অস্থির। তাদের ভাবনা কলমে প্রকাশ করে ঈশ্বর গুপ্তর আশা

'চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।
ব্রিটিশের রাজলক্ষী স্থির যেন রয়';
তার আশংকা ছিল
'দূর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট
সব গেল ব্রিটিশের ফেম।'

জীবিকা রক্ষায় ব্রিটিশের 'ফেম' রাখার গুরুত্ব বুঝে তাদের কাব্য প্রতিনিধি পরম স্তুতিতে কপালের ভাঁজ চওড়া করে লিখলেন

'শুকাইল রাঙ্গা মুখ,
ইংরেজ এর এত দু:খ,

ফাটে বুক হায় হায় হায়।'

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভুরা সিপাহি যুদ্ধ জিতে ক্ষমতায় আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে, সাম্রাজ্য-অভয় মাথায় করে রাণীর পায়ে বেণীর সঙ্গে মাথা লুটিয়ে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জয়গানে আকাশবাতাস মুখরিত করে বললেন

'শুভ সমাচার, বড় শুভ সমাচার।
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার'
'...জয় হোক বৃটিশের,
ব্রিটিশের জয়।
রাজ অনুগত যারা,
তাদের কি ভয়।'
'...এই ভারত কিসে রক্ষা হবে।
ভেব না মা সে ভাবনা।
সেই তাঁতীয়া তোপীর মাথা কেটে,
আমরা ধরে দেব 'নানা'।'

১৮৫৮য় ভারতবর্ষ জাতীয়করণের পর রাণীর রাজত্বের আবেশে আবিষ্ট কোম্পানির প্রসাদপুষ্ট নবজাগরণীরা নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে পূর্ব সময়ের ব্রিটিশ শাসক নিষিদ্ধ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একনিশ্বাসে কোম্পানি-পূর্ব রাজত্ব মুঘল সরকারকেও গালিতে গালিতে ভরিয়ে দেবেন নতুন সময়ে রাণীর প্রকাশ্য দালালি আর সাম্রাজ্য প্রণতিতে। অক্ষয় কুমার দত্ত, 'প্রাচীন হিন্দুগণের সমুদ্র যাত্রা'য় ক্ষমতাচ্যুত কোম্পানিকে গালি দিয়ে আর রাণীকে স্তুতি করে লিখলেন 'ভারত ত বহুদিন হইতেই পরহস্তগত হইয়েছে, কিন্তু নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙ্গজেবের ন্যায় শাসকগণ ও সর্ব্বগ্রাসী [ইওরোপিয়] বণিকদিগের হস্ত হইতে যে নিস্কৃতি পাইয়া মহারাণীর হস্তে আসিয়াছে, ইহা ভারতবাসী অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়। মহারাণীর কালে আমাদিগের কোন কোন বিষয়ে যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।' অক্ষয়কুমার দত্তের মত সাভারকরও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার নিয়ে অক্ষয় দত্ত সৃষ্ট প্রভূত মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সহ তৎকালীন নানা প্রবন্ধে।

সাম্রাজ্যপুষ্ট নবজাগরণী ভদ্রবিত্ত সমাজে প্রখ্যাততম কেশবচন্দ্র সেন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠার কয়েক দশক আগে কর্পোরেট সাম্রাজ্যের বাস্তুতন্ত্র তৈরির অন্যতম উদ্যম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শিক্ষক, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 'পারসিক অভিধান' প্রকাশ। জয়গোপালই প্রথম যিনি বই লিখে বাংলা ভাষা থেকে আরবি-ফারসির NRC, বাংলা ভাষা থেকে যবনী-মিশেল অর্থাৎ আরবি

ফারসি মুক্ত করার প্রকল্প ঘোষণা করবেন। ভূমিকা লিখেছেন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষাতেও। জয়গোপাল আরবি-ফারসিকে বিদেশি ভাষা মানলেও, ইংরেজিকে বিদেশি দাগানোর গুস্তাখি করেন নি। গুরুর পদচিহ্ন ধরে বিদ্যাসাগর মশাই ৮০০ বছরের বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী ছেঁটে আধগজি সংস্কৃত অনুপ্রাস দিয়ে বাংলা বাক্য লেখা শুরু করলেন। আমরা ভুলেগেছি বিদ্যাসাগর মশাইএর ১০০ বছর আগে জন্মানো কবি রামপ্রসাদ সেন লিখেছেন

'তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥
গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কী আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব॥'

সহজ সরল তাত্ত্বিক প্রকাশভঙ্গীর বাংলা সাহিত্য-ভাষা ব্যবহার নস্যাৎ করে সাম্রাজ্য নিদানে সাধুভাষা চালাতে উদ্যোগী হলেন বিদ্যাসাগর মশাই এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

১৮৫৮র বিপ্লব ধাক্কার প্রায় আড়াই দশক পর নতুন ধরণের ইওরোপমন্যতা, নতুন পথের মুসলমান/ইসলামফোবিয়া [উপনিবেশে ইসলাম/মুসলমান বিদ্বেষের উদ্ভব-বিকাশ জানতে জ্ঞানগঞ্জের প্রথম পুথি 'টডের তরবারি' পড়তে পারেন]। সাম্রাজ্য ভিয়েনে তৈরি হল ঐতিহাসিক রোমান্স নির্ভর ইসলামবিদ্বেষী (আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা), ইংরেজ চাঁটা (মা [প্রাচীনকালে] যা ছিলেন - জগদ্ধাত্রী, মা [গত ৫৫০ বছরে] যা হইয়াছেন নির্বসনা কালি, মা [ইংরেজ রাজত্বে] যা হইবেন (স্মিত হাসি দুর্গা)) সাম্রাজ্যচাটা ('শত্রু কে? শত্রু আর নাই') এবং উপনিবেশপন্থী ('বিজয়-সেনানি হেলায় লঙ্কা করিল জয়, ...তিব্বত-চিন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ' অথবা 'ইংরেজ মিত্ররাজা - ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই') উপনিবেশিক ইওরোপমন্য সাহিত্য।

সায়ন চট্টোপাধ্যায়, 'বিইং ইংলিশ ইন্ডিয়ান মিডলক্লাস এন্ড দ্য ডিজায়ার ফর এংলিসাইজেসন' বইতে বলছেন [কেশবচন্দ্র সেনের পাশাপাশি] ভদ্রবিত্ত বাঙালির অনুসরণযোগ্য ইওরোপমন্যতার তুঙ্গ ভিত তৈরি করেন এংলো-স্যাকসন হয়ে ওঠার লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'দ্য এংলো-স্যাকসন' প্রবন্ধে লিখবেন 'আপনাদের কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, এবং এই স্বীকৃতিতে আমি লজ্জাও পাচ্ছি না - আমি অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষা ভালোবাসি। হ্যাঁ - আমি এই ভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ভালোবাসি - অ্যাংলো-স্যাক্সন গৌরবময় ভাষা। আমার কল্পনা অ্যাংলো-স্যাক্সনের ভাষার সমস্ত দীপ্তিময় সৌন্দর্য আমাদের সামনে প্রজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে; এবং [এই ভাষার সামনে] আমি নীরব [থাকি], বিব্রত বোধ করি।' গৌরদাস বসাককে অন্য এক চিঠিতে বলছেন, 'বন্ধু তুমি জান এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা কোনও দিনই দমিয়ে দেওয়া যাবে না। সূর্য ভুল করে নাও উদয় হতে পারেন, কিন্তু আমি ইওরোপে যাওয়ার ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির ওপর ভরসা করতে পার - আগামী এক বা দু'বছরের মধ্যে - হয় আমাকে তোমরা ইংল্যান্ডে দেখবে নয়ত বা আমি [এ বিশ্বে] থাকব না; এই দুটোর মধ্যে যে কোনও একটা পথ আমায় বেছে নিতে হবে।'

দত্তজার ব্রিটিশ রোমান্টিক কবি আখ্যা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সাম্রাজ্য পরিচালন সমিতির সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা হয়েও মাইকেলের ইওরোপিয় প্রিভিলেজড প্রজার সমান হতে চাওয়ার স্পর্ধায় তিতিবিরক্ত বেথুন, বালক দত্তজার আকাশকুসুম স্বপ্ন ভেঙে দেবেন তীব্র সাম্রাজ্য-লগুড়াঘাতে। সাম্রাজ্য-ভাগ্যবিধাতা দলের সদস্য বেথুন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত'র জাতিরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রজা হতে চাওয়ার স্পর্ধাকে সমালোচনা করবেন 'ক্যাপটিভ লেডি'র সাহিত্যমূল্য নিয়ে একটাও শব্দ খরচ না করে।

যে মধুসূদন বাংলার কোলে ফিরে আসছেন, সেই মধুসূদন ব্রিটিশত্ব অর্জনের জন্যে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, ব্রিটিশ জামাকাপড় পরেছেন, যশোরের লব্জ জিভ থেকে মুছেফেলেছেন, ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, এমন কী কয়েক বছরের মধ্যে

দুই 'ইংলিশ' মহিলাকেও বিয়ে করে ১৮৪৯এ 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' লিখলেও আর তাঁর ইংরেজি কবিতা প্রকাশ হবে না। ১২ বছর পরে অমরত্বের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। ইংরেজি ভাষার কবি হওয়ার উৎসাহ উপড়ে ফেলার কারন নিয়ে গবেষকেরা দ্বিধাবিভক্ত। 'প্রডিগ্যাল সন'এর বাংলায় ফেরার ঘটনাকে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আখ্যা দিয়েছে শেকড়ে ফেরা। সায়ন চট্টোপাধ্যায়, 'বিয়িং ইংলিশ' বইতে বলছেন একে কেউ বলছেন ইংরেজি ভাষায় কাব্য লেখার ভুল সিদ্ধান্ত ঝেড়ে ফেলা, কেউ একে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, রোসিঙ্কা চৌধুরী বলবেন 'হিস্টোরিক শিফট', মুধুসূদনের কৃষ্টিগত পরিচয় বিকাশে সহায়ক হবে। রোসিঙ্কার বিশ্বাস দত্তজার এই 'ইন্ডিয়াননেস' আত্মীকরণ যে শুধু মধুসূদনেই আসছে এমন না, সার্বিক ভদ্রবিত্ত বাঙালি সমাজেও প্রোথিত হচ্ছে।

সায়নের পাঠকদের অন্য একটি ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিচ্ছেন। মধুসূদন 'ক্যাপটিভ লেডি' উপনিবেশিক আমলাদের কাছে আত্মপ্রচারের লক্ষ্যে পাঠালেন। মধুসুদনের প্রশংসা পাওয়ার আশা দূরাশাই রইল। অধিকাংশই রাজপুরুষ নিন্দা জানালেন। তখনও মধুসূদনের মনে উন্নত ব্রিটিশদের সমকক্ষ হওয়ার আশা জ্বলছে। গৌরদাস বসাককে গর্বভরে লিখছেন, মাদ্রাজের ব্রিটিশ এডভোকেট জেনারেল তার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাষায় কথা বলেছেন। স্বপ্ন পতনের পাল্টা আঘাত এল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ থাকবন্দী থেকে। মধুসূদনের বই পেয়ে গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য বেথুন, গৌরদাস বসাককে তিরষ্কার করে লিখলেন [H]e [Dutt] could render far greater service to his country and have better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the studyof English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events, he must write। মধুসূদন যে সাম্রাজ্য শাসক-সমকক্ষ, ইংরেজ-বন্ধু হতে চাইছেন, ইংরেজ হতে চাইছেন, বেথুনের মত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। কোলাবরেটরেরা দাস্যভাব নিয়েই সাম্রাজ্যের লুঠ খুন অত্যাচারের ছোট তরফের অংশিদার হবে। উপনিবেশিকেরাই যদি শাসক-সমকক্ষ হয়, তাহলে মেট্রোপলিটনের সাম্রাজ্য রক্ষা মাথায় ওঠে। বেথুন মধুসূদনের কাব্যচর্চাকে পাত্তা দিচ্ছেন না, মধুসূদনের ব্রিটিশত্ব অর্জন, ব্রিটিশ-বন্ধুত্বের উচ্চাশার গোড়া কাটছেন। মধুসূদনের পক্ষে সাম্রাজ্য পরিচালকদের তিরষ্কার মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। হয় তাঁকে কাব্য রচনা বন্ধ করতে হবে, না হয় বাংলা ভাষা আপন করতে হবে। মধুসূদন বুঝেছিলেন, বেথুনের মত সাম্রাজ্য পরিচালন সমিতির সদস্যের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা কাব্য কেরিয়ারের পক্ষে ক্ষতিকারক।

গবেষকেরা যে জাতীয়তাবাদী প্রণোদনার কথা বলেন, তাঁর হৃদয়ের আকুতি দেখেন - যে সব আদৌ ঠিক কী না বলা মুশকিল, হয়ত ঠিক, কিন্তু সাম্রাজ্য হুমকিতে যে তিনি টলছেন, বাংলায় কাব্য রচনা করতে বাধ্য হচ্ছেন, এই তথ্য পরিষ্কার। মধুসূদন দত্তের ঔদ্ধত্য ধ্বংস করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেরা মুকুট ভারতবর্ষ পরিচালক দলের সদস্য মধুসূদনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘৃণা জাগিয়ে। সাম্রাজ্য বিষভাষে মধুসূদন প্রমাণ গুনবেন ক্ষমতাময় তিরষ্কারের তর্জনী অগ্রাহ্য করতে না পেরে। মাথায় রাখতে হবে, তিনি বাংলায় ফিরলেও, বাংলা ভাষাকে কাব্য-থিম করলেও কাব্য আঙ্গিক কিন্তু ছিল মৌলিকভাবে ইওরোপিয়। মধুসূদন হয়ত ভাষা পাল্টেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপমন্যতার আত্মনিবেদন থেকে সরেন নি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, জাতিবাদী সাম্রাজ্য পরিচালক মধুসূদনের ভাই সম্বোধনে অতিষ্ঠ। মাত্র কয়েক বছর পরে আরেক প্রখ্যাত বাঙালির ভাই ডাক শুনতে বাধ্য হচ্ছে সাম্রাজ্য কর্তারা খোদ মেট্রোপলিটনে। যে ব্রিটিশ জাতিবাদী সাম্রাজ্যবাদ মধুসূদনকে বাধ্য করিয়েছিল ইংরেজি ছেড়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে, সেই সাম্রাজ্যবাদী আবার, সাধারণ কেরাণী হিসেবে জীবন শুরু করে ব্রিটিশ শাসকের অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে ব্যাংকের দেওয়ান পদে উত্তীর্ণ হওয়া বাঙালি যুগপুরুষের বাড়ির বিখ্যাততম উত্তরপুরুষ ধর্মগুরু বাঙালি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রিটিশ-ভারতীয় ভাই-ভাই তত্ত্বকেই শুধু গলার্ধকরণ করবে না, ব্রিটিশ মেট্রোপলিটনও মাথা নামিয়ে সোনামুখে সেই তত্ত্ব হজমও করবে। আশ্চর্যের হল, ব্রিটিশ-ভারতীয় ভাইভাই তত্ত্ব কিন্তু বাঙালি ধর্মগুরুর আবিষ্কার নয়, এর আবিষ্কারক এক জার্মান-জাত ব্রিটিশ খ্যাতি অনুগামী ম্যাক্সিমিলিয়ন ম্যাক্সমুলার।

ম্যাক্সিমিলিয়ন মুলার

১৮৫৭র যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে উপনিবেশে ভদ্রবিত্ত কোলাবরেটরেরা লুঠেরা খুনি, গণহত্যাকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আরও বেশি সেবা দিতে কোমর বাঁধছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ্য অর্থ সাহায্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলারের রান্না করা ভারতবর্ষভূমে ককেসাসিয় আর্য অভিবাসন তত্ত্ব (এখন থেকে আর্যতত্ত্ব) দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশিক প্যাক্স ব্রিটানিকা নীতি বিস্তারে আর সম্রাজ্যরক্ষার হাতিয়ার বানিয়ে কোলাবরেটর ভদ্রবিত্তের পাতে পরিবেশন করা হবে। বহু পুরোনো আর্যতত্ত্বের নবতম রূপকার ম্যাক্সমুলার আর্যত্বকে জাতিবাচক অভিধায় অভিহিত করলেও, সে ভুল সংশোধন করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ভাষায় বডিন অধ্যাপনার প্রতিযোগিতায় ছিটকে যাওয়ার ক্ষোভে আর্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে

ম্যাক্সিমিলিয়ন মুলার

থাকা জাতিবাদীতা কেড়ে নেবেন, তার নখ, দাঁত, বিষ উপড়ে নিরীহ ভাষা প্রপঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবেন। কিন্তু ততদিনে আর্যতত্ত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৈধতার ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছে। আর্যতত্ত্ব ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রের নাটবলটু ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রবিত্তিয় প্রজাদের প্রশমিত করিয়ে, সাম্রাজ্য খিদমতে আজানুলম্বিত হওয়ার কাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর্যতত্ত্বকে শুধু বৈধতাই দেবেন না, তাঁর ব্রান্ডের ব্রাহ্ম আন্দোলনের তাত্ত্বিক বাহনও করবেন সে যুগের প্রখ্যাততম বাঙালি কেশবচন্দ্র সেন। তিনি 'বৈজ্ঞানিক' আর্যতত্ত্ব অবলম্বনে ব্রিটিশদেরই শুধু ভারতবর্ষের মেলার মাঠের ভিড়ে 'হারিয়ে যাওয়া ভাই' বলবেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে 'গডসেন্ড, ভগবৎইচ্ছা' আখ্যায় ভূষিত করে ১৮৫৮র বিপ্লবের উত্তর সময়ে ব্রাহ্ম ভাইবেরাদারদের উপনিবেশ লুঠে রাণীর পায়ে দণ্ডিকাটা ছোটতরফ হিসেবে, অখ্যাত-বিখ্যাত ভদ্রবিত্তের চাকুরি, দালালি, উমদোরি, বিনা মাইনেয় গোয়েন্দাগিরির অংশিদারিত্বও নিশ্চিত করবেন।

ম্যাক্সমুলারের তত্ত্ব-বাহক বাবুকেশবচন্দ্রদের সাম্রাজ্যরক্ষার আর্যতত্ত্ব বাজারে আসার ১০০ বছর আগে বৃহত্তর বাংলার গ্রামীণেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খুন অত্যাচার লুঠের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। ফকির সন্ন্যাসী, জঙ্গলমহল, সামশেরগাজী, সন্দ্বীপ-হিজলি (কাঁথির) মালঙ্গী, তন্তুবায়, চাকমা, নীল, রেশম, আফিম চাষী, পাহাড়িয়া, সুবান্দিয়ার মত হাজারো গণ স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই মিলে যাবে ১৮৫৭র বৃহত্তর স্বাধীনতার লড়াই সমুদ্রে। ১৭৬৩র ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পলাশীর লুঠ উদ্বৃত্তে সেজে পশ্চিম ইওরোপিয় পুঁজিবাদী ভদ্রলোকেরা বাংলা সুবায় যে উপনিবেশ চাপিয়ে

দেবে, সেই প্রকল্পে তারা হাত পাকিয়েছে অন্তত দেড়শ বছর আগে পশ্চিম ইওরোপে।

কার্ল উইনারলিন্ড, 'ক্যাজুয়েলিটি অব ক্রেডিট - দ্য ইংলিশ ফিনানসিয়াল রেভলিউশন ১৬২০-১৭২০' বইতে বলছেন ১৬০০ থেকেই উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পত্তির অধিকার নতুন করে সাজিয়ে তোলা, উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে টিউডর, স্টুয়ার্ট আমলে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমিহীন, কাজহীন, উদ্বৃত্ত হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হল। এই পর্ব থেকেই পশ্চিম ইওরোপজুড়ে গ্রামীণ পাগান সমাজের ওপর ভদ্রবিত্ত সমাজের অপরিসীম অত্যাচার নেমে আসবে। পশ্চিম ইওরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের চাষী, কারিগর, পশুচারক, দেশিয় পেশাদারদের গ্রাম থেকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করে পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্য সম্পদ লুঠ আর দাস ব্যবসাজাত অর্থে তৈরি কেন্দ্রিভূত কারখানার প্রায় দাস-শ্রমিক বানানোর কাজে সহায়ক হবে ইওরোপিয় নবজাগরণী ভদ্রবিত্ত সমাজ। প্রথমত আমেরিকা লুঠ, তারপর পলাশীর লুঠে বলীয়ান ব্রিটিশ কর্পোরেট পুঁজি ভদ্রবিত্ত মার্ফৎ ইওরোপিয় পাগান জ্ঞানচর্চা পরম্পরার ওপর কর্পোরেট দখলিসত্ব কায়েম করে পশ্চিম ইওরোপের দেশে দেশে চাষী, কারিগর, পশুচারক, ধীবরদের ওপর উপনিবেশ চাপানোর ভদ্রবিত্তীয় কাজে হাত পাকিয়ে আরও বড় বিশ্বলুঠে বেরোবে। ইওরোপ জুড়ে কর্পোরেট পুঁজি ছোটলোকদের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চা, বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ প্রযুক্তি দখল আর ধ্বংস করে কেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থার উপনিবেশিক জাঁতাকল বিকাশের গবেষণা চালাল। ইওরোপিয় উপনিবেশে বিকেন্দ্রিভূত জ্ঞানচর্চা, উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গা নিল পুঁজি নির্ভর সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সাম্রাজ্য বিকাশ তত্ত্ব।

পলাশীর উদ্বৃত্তে, ১৭৭০এর বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গণহত্যাইয় ১ কোটি বাঙালি খুন আর সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের ভিতে ১৭৮০তে ইংলন্ডে প্রথম কারখানা তৈরির ৭ দশক কেটে যাওয়ার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক, জার্মানজাত ম্যাক্সমুলারের মাধ্যমে ব্রিটিশ আর্যতত্ত্বের আবির্ভাব। সেই তত্ত্ব ভিত্তি করে কেশবচন্দ্র সেন উপনিবেশ-মেট্রোপলিটন দুই ভাই এক ঠাঁই প্রবচন পেশ করবেন, যাতে ভদ্রবিত্তকে প্রত্যক্ষ্যভাবে উপনিবেশের লুঠ, খুন অত্যাচারের কাজে আরও বেশি সহায়ক করে তোলা যায়। ভুললে চলবে না, আর্যতাত্ত্বিক আচার্য ম্যাক্সমুলার ব্রাহ্মদের চার্চ অব ইংলন্ডের সদস্যপদ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তো এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থ, খ্রিষ্ট মিশনারি-স্বার্থ আর ভদ্রবিত্তিয় ব্রাহ্ম-স্বার্থ মিলেমিশে সাম্রাজ্যপন্থী আর্যতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে ভারতভূমিতে সর্বজনমান্য সাম্রাজ্যরক্ষা তত্ত্বে, উপনিবেশিক প্যাক্স ব্রিটানিকা বিস্তার প্রকল্পে পরিণত হবে। এডওয়ার্ড সঈদ, মাইকেল ফুকো, টমাস

ট্রাউটম্যানের অনুসরণে আর্যতত্ত্বকে প্রাচ্যজ্ঞানচর্চা, হিন্দুআধিপত্যবিস্তার প্রকল্প হিসেবে গণ্য করব ঠিকই, কিন্তু ততদিনে ফলেফুলে বিকশিত প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্য পিরামিডের মাথায় বসে থাকা শাসকদের প্রত্যক্ষ্য প্রণোদনায় স্বতন্ত্রবিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে শুধু সাম্রাজ্যরক্ষারই হাতিয়ার হবে না, দু'ফলা ছুরির মত উপনিবেশিত সাম্রাজ্য-বন্ধু কোলাবরেটরদের সামাজিক-অর্থনৈতিকও স্বার্থ রক্ষা করবে। ট্রাউটম্যান বলেছেন প্রাচ্যবিদেরা মূলত এশিয় ভাষার জ্ঞান, বিভিন্ন পরোক্ষ সূত্র অনুসরণ করে প্রাচ্যের রেণু বিশ্লেষণ করলেন। ম্যাক্সমুলারের [এবং প্রাচ্যতত্ত্বের আদিগুরু জোনসেরও] সংস্কৃত জ্ঞান নিয়ে আমরা অতীতে প্রশ্ন তুলেছি; এখানে বিষয়টি তিলার্ধ ছুঁয়ে মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করব। অথচ দুজনের সংস্কৃত অনুবাদ আজও সর্বজনমান্য।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা আর বিস্তারের তাত্ত্বিক প্রয়োজনে ব্যর্থ ক্রুসেডের ৬০০ বছর পরে ইওরোপিয় সাম্রাজ্যের তুঙ্গ দিনে আবির্ভূত হবেন জার্মানজাত ম্যাক্সমুলার। জার্মানিতে উচ্চশিক্ষায় অকৃতকার্য ফ্রেডরিশ ম্যাক্সিমিলিয়ন মুলার ভাগ্যান্বষণে ব্রিটেনে অভিবাসিত হয়ে এলেন সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবে। তাঁর সংস্কৃত শেখার তথ্য আর সময় নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি আজও। অনুবাদ করার মত সংস্কৃত শিখতে প্রয়োজন কয়েক দশকের ব্যাপ্তি। আর সবথেকে বেশি প্রয়োজন, সদগুরুর নির্দেশ। যিনি ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে বেড়ে উঠছেন, এবং সে দেশে সংস্কৃত কথ্য বা লেখ্য বা শিক্ষার ভাষা নয়, তার ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি সূত্র কঠোরভাবে প্রযোজ্য।

মুলারের প্রথম জীবনী লেখক স্ত্রী আর পুত্র। তাঁরা বলছেন ১৯ বছর বয়সে ১৮৪৩এ লিপজিগ বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। ১৮৪৬ তে ভাগ্যান্বেষণে লন্ডনে আসা। জার্মান ভাষায় প্রেম-পরিণয়ের বাজার-ব্যর্থ নভেল লিখছেন। অথচ প্রথম জীবনে কার কাছে সংস্কৃত শিখেছেন সে তথ্যে জীবনীকারেরা চুপ। মুলার ভারতবর্ষে আসেন নি। অথচ সংস্কৃত শিখেছেন। মুলার যখন ভারতবর্ষকে জানতে উৎসুক, তখনও ভারতবর্ষে সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিলনা। ক্রুসেডের দৌলতে ইওরোপে আরবি ফারসি শেখার সুযোগ থাকলেও, বিধিবদ্ধ সংস্কৃত শেখার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে নি। যে ভাষা কথ্য নয়, সে ভাষা শিখতে উপযুক্ত শিক্ষক, সময় প্রয়োজন। সে শিক্ষা শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। মেকলের আত্মীয় ট্রেভলিয়ান প্রধান পুরোহিত। ভাগ্যান্বেষী মুলার ক্রমে হয়ে উঠলেন ভারত বিশ্লেষণের কারিগর। তৈরি হল আর্যতত্ব।

মুলারকে কোঁচড়ভর্তি আর্থিক সাহায্য দিয়ে সাম্রাজ্য তাত্ত্বিক হিসেবে গড়ে পিটে নেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তাঁর কাজ হল সাম্রাজ্যের দাবিপূরণে আর্যতত্ত্বর নব কলেবর দান। যে মুলার লন্ডনে অভিবাসিত হয়ে আসার কিছু বছরের মধ্যেই বেদ অনুবাদ করবেন, তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান কোথায় হয়েছিল এই প্রশ্নটি আমরা তুলছিলাম

এক দশক আগেই। আত্মজীবনী এবং মুলারের পুত্র আর স্ত্রীর লেখা জীবনী অনুসরণে দেখছি জিমনাসিয়ামে উচ্চ শিক্ষা শেষ করার পর মুলার ১৮৩৯এ লিপজিগের নিকোলাই বিদ্যালয়ে পড়ার পরিকল্পনায় অঙ্ক, আধুনিক ভাষা এবং বিজ্ঞান শিখছেন। তখনও সংস্কৃত শেখার ইঙ্গিত পাচ্ছি না। লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ফিললজি পড়তে। ডিগ্রি পেলেন ১৮৪৩এ। স্পিনোজার নীতিশাস্ত্র (এথিক্স) নিয়ে ডিসারটেশন পত্র জমা দিয়ে ডক্টরেট উপাধি পেলেন।

যতদিন না মুলার, বুনসেন, ট্রেভলিয়নের দেখা পেয়ে মনগড়া আর্যতত্ত্বে প্রভাবিত করছেন, ততদিন নব্য ভারতের প্রাচ্যবাদী ইতিহাস লেখা হয় নি, ততদিন উচ্চপারিশ্রমিকের বেদ অনুবাদেও কোম্পানি রাজি হয় নি, আর তার অর্থকষ্টও কাটে নি। মুলারের সঙ্গে কোম্পানির যোগাযোগ হল এমন এক সময়ে যার কিছু দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঝাঁপ বন্ধ হবে। সে তথ্য কোম্পানি ১৮৩৩র সনদ থেকে জানে। মুলার জানেননা। উঠে যাওয়ার ১৩ বছর আগে মুলারকে কপালে চোখ তোলা পরিমানে অর্থ বরাদ্দ করছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কয়েক বছর পর সিন্দুকের ডালা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে জেনেও, মাত্র কয়েক বছরের সংস্কৃত জ্ঞান সম্বল এক শিক্ষার্থীকে, বিশ্বের প্রথম কর্পোরেট শাসক কোম্পানি বিপুল অর্থ খয়রাতি করছে কেন সেই খটকা আজও কাউকে কেন বিদ্ধ করে নি জানিনা! অথচ ১৮৪৬এ প্রুসিয়ার কুটনীতিক ব্যারন ভন বুনসেনকে নিয়ে অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হোরেস উইলসন কোম্পানিকে আবেদন করলেন ঋগ্বেদের অনুবাদের প্রকল্পে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে সাহায্য করতে। সে প্রস্তাব খারিজ হয়।

মুলারের সংস্কৃত শেখা সংক্রান্ত তথ্য জানতে বুঝতে কোমর বেঁধেছি দেড় দশক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে মহাফেজখানার সমস্ত কাগজপত্রের হিসেব আছে সূত্র https://archives.bodleian.ox.ac.uk/repositories/2/resources/3290। বদলিয়ান আর্কাইভ এন্ড ম্যানুস্ক্রিপ্টস সাইটে Archive of Friedrich Max Müller and of his wife Georgina Adelaide শীর্ষকের নথিপত্র দেখা যায়। তাঁর স্ত্রী পুত্রের লেখা জীবনীতে রয়েছে তিনি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পিনোজার দর্শনে ডক্টরেট করেছেন। জীবনী গ্রন্থে তাঁর শংসাপত্রের অনুলিপি দেখি নি। এমনকী উইকিপিডিয়া অথবা ম্যাক্স মুলর ভবন-গেট্যে ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটেও নেই। কেউই প্রতিলিপি দেখাচ্ছেন না। অথচ এই উপাধি ভিত্তি করে মুলর অক্সফোর্ডে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে লড়াই করছেন।

সরাসরি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়কে ইমেল করা গেল। ২০১২র ৩০ আগস্ট লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রাবন্ধিককে উত্তর লিখে নথি সহ একটা মেল

পাঠালেন। লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১২য় বিশ্বেন্দুর মেলের উত্তরে লিখেছেন মুলার মাত্র সাতটি ক্লাস করেছেন। তাঁরা মুলারের ডক্টরের উপাধি পাওয়ার দাবি স্বীকার করছেন না। একই মেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্বেন্দুকে যে তিনটি নথি ইন্টারেস্টিং পাঠিয়েছেন, তার নকল পরের পাতাগুলোয় পাঠকের জন্যে তুলে দেওয়া গেল। জার্মান ভাষায় লেখা আমরা উদ্ধার করতে পারি নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিতে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার না হয়ে যায় না।

(Buschner <indsekr@rz.uni-leipzig.de> 08/30/12 at 4:07 PM

To

biswendu@yahoo.com

Message body

------- Weitergeleitete Nachricht / Forwarded message -------

Datum: Thu, 30 Aug 2012 12:28:05 +0200

Von: panser@rz.uni-leipzig.de

An: biswendu@yahoo.com

Betreff: Re: WG: (Fwd) WG: Query from Indian Researcher -- AZ

7513.50/2012/924

Dear Biswendu Nanda, At the university archive of Leipzig is neither an entry in the book of promotion nor a promotion file of Friedrich Max (Maximilian) Müller. He was a student at the university from 1841 to 1844. There is an entry in the discharge register (with attended lectures) and two entries in the register of students.

Enclosed you can find the corresponding digital copies.

Yours sincerely, Nicole Panser, Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig, Tel.: +49 341 9730200, Fax: +49 341 9730219, E-Mail: archiv@uni-leipzig.de, Internet: www.archiv.uni-leipzig.de,

বিশদে পড়ুন সুত্রঃ http://lokfolk.blogspot.in/2012/08/blog-post_30.html)।

অর্থাৎ ম্যাক্সমুলারের সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের দাবি যেমন ধোঁয়াশায় ঘেরা তেমনি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পাওয়ার দাবিও নির্জলা অনৃত।

নথি ১

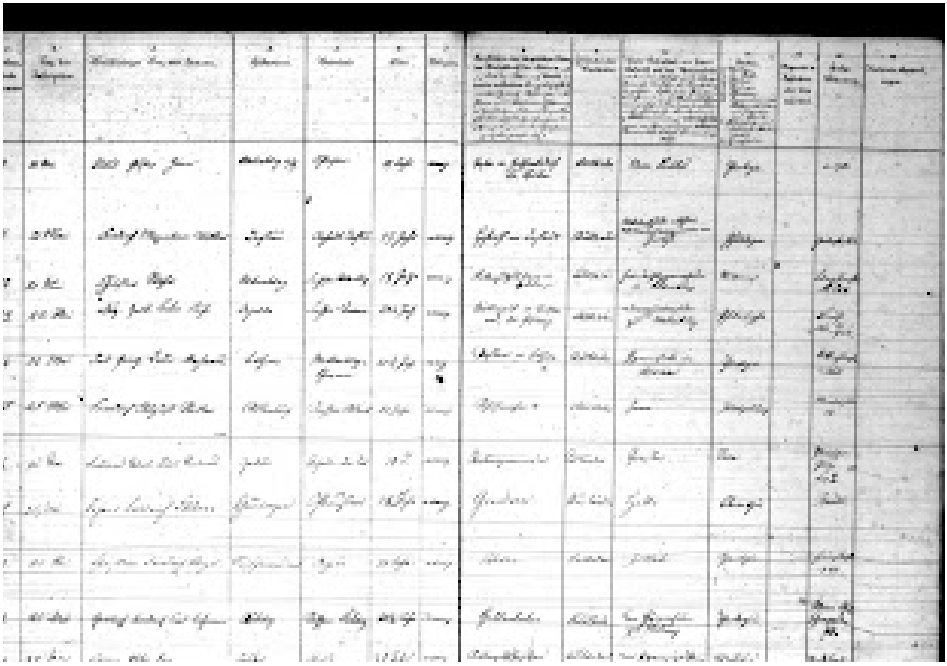

নথি ২

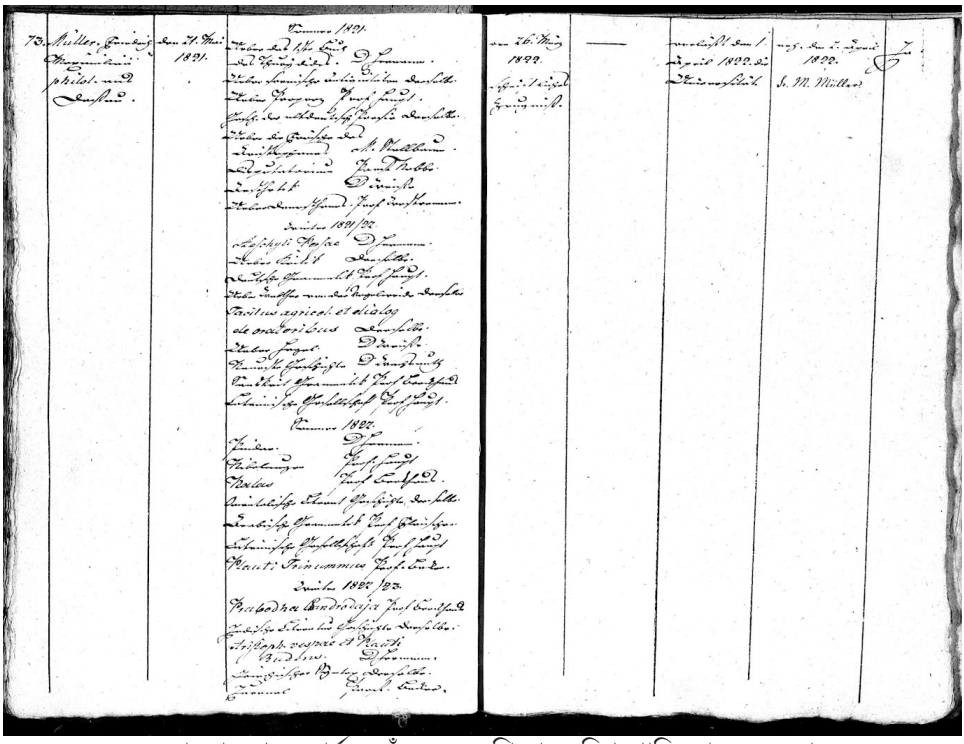

আমরা এখনও পর্যন্ত তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার হদিশ পাচ্ছি না। শুধু বলা হচ্ছে, 'He also displayed an aptitude for classical languages, learning Greek, Latin, Arabic, Persian and Sanskrit.', তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, আরব, পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষা শিখতে উৎসাহ দেখালেন। অস্যার্থ তখনও তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হওয়া বাকি। অক্সফোর্ডে অভিবাসিত হয়ে এসে চাকরি পাওয়ার আগে বার্লিনে ফ্রেড্রিশ শিলিংএর অধীনে উপনিষদ অনুবাদের কাজ শুরু করলেন - অথচ সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখ নেই। ফ্রানজ় বপের কাছেও ভাষা শিক্ষানবিশি করবেন। এখানে ভাষার ইতিহাস এবং ধর্মের ইতিহাসকে মেলাতে শিখতে শিখতে হিতোপদেশ, নীতিকথা অনুবাদে হাত দেবেন। ১৮৪৫এ প্যারিসে গেলেন উজিন ব্যুরনফের কাছে সংস্কৃত শিখতে। ১৮৪৫তে ২৩ বছর বয়সে, মুলার বিধিবদ্ধ সংস্কৃত শেখার কাজ শুরু করলেন। কয়েক মাসের মধ্যে এমনই সংস্কৃত ভাষায় দখল এল যে, ব্যারন ব্যুরনফ তাকে ঋগ্বেদ অনুবাদ করতে নির্দেশ দেবেন। ১৮৪৬এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হেফাজতের ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে গবেষণা করতে লন্ডনে পাড়ি দেওয়া। অথচ ১৮৪৬এ তাঁর ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষক ব্যারন ভন বুনসেন, অধ্যাপক হোরেস উইলসন কোম্পানিকে আবেদন করেছিলেন ঋগ্বেদের অনুবাদের

প্রকল্পে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে সাহায্য করতে। কোম্পানি কান দেয় নি।

এই ছিল মুলারের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ইতিহাস; অথচ সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার কোলাবরেটর, সংস্কৃতজ্ঞ রামমোহন রায়ের দাবি, সাধারণ পড়ুয়ার সংস্কৃত শিখতে এক জীবনও যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ সাতের দশকে অষ্টম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক সংস্কৃত পড়ে বেদ অনুবাদের পাগলামি। মুলারও সেই রকম পাঠ সাঙ্গ করে বেদ অনুবাদ করার যোগ্যতা অর্জন করলেন কোম্পানির পড়ন্ত সময়ে সিন্দুক থেকে বিপুল অর্থ সাহায্য নিয়ে। মুলারের সাম্রাজ্য-সঙ্গ নিয়ে অন্য প্রবন্ধে বিশদে আলোচনা করেছি, এই প্রবন্ধে সেই আলোচনা অনাবশ্যক। মুলারের আর্যতত্ত্বের রাজনীতিতে দৃষ্টি দেওয়ার আগে আরেকটা জরুরি প্রশ্ন তুলে দেওয়া গেল, মাত্র ১ বছরের সংস্কৃত জ্ঞান নিয়ে ম্যাক্সমুলার যে বেদ রচনা করলেন, সে জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে কত মূল্য দিয়েছিল?

বলদর্পী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ম্যাক্সমুলারের আর্যতত্ত্বকে সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার করবে এই তথ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুলার ইংলন্ডে অর্থ কষ্টে দিন কাটাতেন। পালপ ফিকশন, সহজ সুড়সুড়ির ভিক্টোরিয় প্রেমের গল্প, উপন্যাস লেখাতেও সাফল্য অধরা থাকায় মরিয়া হয়ে ভারত শাসক কোম্পানিকে শাস্ত্র অনুবাদের প্রস্তাব দিলেন। যতদিন না তিনি সাম্রাজ্যবাদী আমলা ট্রেভলিয়নের দেখা পেয়ে আর্য কাহিনী শুনিয়ে উচ্চপারিশ্রমিকের বেদ অনুবাদের বরাত পাননি, ততদিন তার অর্থকষ্ট কাটে নি। ট্রেভলিয়নের মধ্যস্থতায় বেদ অনুবাদের জন্য পাতা প্রতি ৪ পাউন্ড বরাদ্দ হল। আজকের হিসেবে সাধারণ, কিন্তু সেদিনের হিসেবে? জন উইলিয়াম এডামসন, 'ইংলিশ এডুকেশন ১৭৯৮-১৯০২' বইতে বলছেন ১৮৫৩তে ইংলন্ডে পুরুষ শিক্ষকের গড় আয় ছিল বছরে ৯০ পাউন্ড, মহিলাদের ৬০ পাউন্ড। ২০০০য় ব্রিটিশ শিক্ষক গড় আয় করতেন ১৪০০০ পাউন্ড থেকে ৩৬০০০ পাউন্ড। অর্থাত দেড়শ বছরে মাহিনা ২০০গুণ বেড়েছে। ম্যাক্সমুলারের বরাদ্দ ৪ পাউন্ড, এডামসনের হিসেবে ২০০০এর ৮০০পাউন্ড প্রতি পাতা, আজকের অঙ্কে ৬৪০০০ টাকা প্রতি পাতা (এই হিসেব ২০১৬র)। ২০০ পাতার জন্য আজকের দিনের ১,২৮,০০,০০০ টাকা। ডিজিটাল সময়েও যত বড়ই কর্পোরেটিয় অনুবাদ প্রকল্প হোক না কেন, বিশ্বের মহানতম পুস্তক অনুবাদ করতে এই পরিমান অর্থ বরাদ্দ কপালে চোখ তোলার মত নয় কী? ১৮৩৩এর সনদে বাণিজ্য অধিকার কেড়েনেওয়া কোম্পানি স্বপ্নেরও অতীত পরিমান অর্থ বরাদ্দ করে মুলারের স্বপ্ন কেন সাকার করছে, সে প্রশ্ন আজও ওঠে নি।

ব্রিটিশ সমৃদ্ধির মূল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ উপনিবেশে প্রভাবশালী এবং উপনিবেশ অনুগামী গোষ্ঠী ছিল ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত ব্রাহ্ম কোলাবরেটরেরা। ম্যাক্সমুলারের

তত্ত্ব প্রচারে তারাই উৎসুক বাহন হলেন। তাদের হাত ধরে আর্যতত্ত্ব ভদ্রবিত্ত সমাজে ছড়াল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র আর্যতত্ত্বকে যেমন উপনিবেশে বৈধতা দেবেন, তেমনি মেট্রোপলিটনে গিয়েও আর্যতত্ত্বের পক্ষে দাঁড় করাবেন। প্রতিদানে সাম্রাজ্য প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রচারে কেশবচন্দ্রের কাছে চাইবে আরেকটি প্রায় অসম্ভব উপহার। সেই দাবি তাঁর সংগঠনকে ছারখার করে দিতে পারে, তার ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তাকে মাটিতে টেনে নামাতে পারে জেনেও তাঁকে সেই প্রস্তাবে রাজি হতে হবে। এই সামগ্রিক কাণ্ডে লাভের গুড় গুছিয়ে ঘরে তুলবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পাশাপাশি উপনিবেশে কাজ করা ব্রিটিশ মিশনারি এবং ভদ্রবিত্তরাও। ব্রিটিশ আর্যতত্ত্বের উদ্ভব আর বিকাশের ইতিহাস, ব্রাহ্মধর্মীয়দের আর্যতত্ত্ব আত্মীকরণ, স্বার্থপূরণ আলোচনা করে সাম্রাজ্যের শর্তে প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রসারে ব্রাহ্মগুরু কেশবচন্দ্রের আত্মসমর্পণের উপাখ্যানের বাখান আলোচনা করব।

উনবিংশ শতকের ইওরোপিয় রাজনীতি এবং প্রাচ্যবিদ্যার উদ্ভব

তুর্কি[পূর্ব] সমস্যা

১৭৭৪এ উসমানিয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতল রুশ সাম্রাজ্য। এশিয়ার অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্য তুর্কির উসমানিয় সাম্রাজ্যের পড়ন্ত দশা। ধ্বসে যাওয়া তুর্কি সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থ বজায় রাখতে ইওরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মুখোমুখি। ইওরোপিয় রাজনীতিতে এই রাজনৈতিক সমস্যার নাম পূর্ব দেশের সমস্যা, ইস্টার্ন কোশ্চান। উনবিংশ শতকজুড়ে ইংলন্ড, জার্মানি, রুশ আর বল্কান রাজ্যগুলো আন্তর্জাতিক তুর্কি সমস্যা সমাধানে নানাভাবে লড়েছে।

ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নিরসনে ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত রুশ আর উসমানিয় তুর্কি সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্রিমিয়া যুদ্ধে উসমানিয় সাম্রাজ্যের পতনের আশংকায় এশিয়াজুড়ে রুশ সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাব্যতায় শঙ্কিত ব্রিটেন, ফ্রান্স উসমানিয় সাম্রাজ্যকে নৌবহর ধার দিলে রুশ শক্তি পরাজিত হয়। ১৮৭১এ ফ্রান্স, জার্মান ফ্রান্স-প্রুসিয় যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। উপনিবেশের স্বার্থরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলি ১৮৭৮এ সান স্তেফানো চুক্তি করেন। এটা পরে বার্লিন চুক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হল। তুর্কিরা বুলগেরিয়া অধিকার ছেড়ে দিল। জুন জুলাই মাসে বার্লিন কংগ্রেসে রুশ জার্মানি ব্রিটেন আলোচনায় বসে। ক্ষিপ্ত দ্বিতীয় জার আলেকাজন্ডার বার্লিন চুক্তিকে নস্যাৎ করে এই চুক্তিকে রুশেদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের নেতৃত্বে বিষাক্ত ইওরোপিয় জোট বললেন। ইওরোপ তখন তীব্র রাজনৈতিক ডামাডোলের আবর্তে হাবুডুবু। দক্ষিণ আর পশ্চিম এশিয়ার উপনিবেশ বাঁচানোর জন্যে ব্রিটেন মরিয়া। লুঠের উর্বরতম ক্ষেত্র দক্ষিণ, পশ্চিম এশিয়া হাত ছাড়া হলে লন্ডন পথে বসবে, এ তথ্য তখন ইওরোপে

ওপেন সিক্রেট। সক্রিয় রুশেদের প্রভাব থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম এশিয় উপনিবেশগুলো সামলাতে লন্ডনকে নতুন তাত্ত্বিক অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল - যার কূটনৈটিক জগতে যার নাম 'দ্য গ্রেট গেম'। এই মুহূর্তে লন্ডনের করণীয় কী?

প্রাচ্যবাদ চর্চা

এশিয়ায় রুশ প্রভাব বাড়তে থাকা সমস্যার সমাধান খুঁজতে ব্রিটেনের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। সাম্রাজ্য জানে উচ্চমন্য ব্রিটিশ সভ্যতার রেণু রপ্তানি সাম্রাজ্য-স্থায়িত্ব সহায়ক। দক্ষিণ এশিয়ায় সভ্যতা আমদানি আর লুঠ সম্পদ রপ্তানির কাজ ব্রিটিশদের আগে কোনও সাম্রাজ্যই করে নি কারন প্রত্যেকেই 'এক দেহে হল লীন'। সৈয়দ নাকিব মাহমুদ লিখছেন 'এই উপমহাদেশে আগত মুসলমানেরা তাদের মাতৃভূমিই ত্যাগ করেনি, মাতৃভাষাও ত্যাগ করেছেন। আমরা যদি প্রথম থেকে লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাব সুলতান গজনভি আসলে জেবুস্তানি ছিলেন। মোহাম্মদ ঘুরি ছিলেন খোরাসানি। কুতুবউদ্দিন আইবেক তুর্কি ছিলেন। এরপর খিলজীরা দাক্ষিণী পুশতুতে কথা বলতেন। ইব্রাহিম লোদী উত্তরী পুশতুতে। মোগলদের কথিত চাগতাই ভাষা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি।' ১৬৩০এর দশক থেকে বাংলায় প্রথমে ব্যবসা তার একশ বছর পরে সাম্রাজ্য তৈরি করেও একজনও ব্রিটিশ প্রশাসক বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তারা দুবাস বা দোভাষী রাখতেন। উপরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল এশিয়া সম্পদ ইওরোপে চালান করে ইওরোপে পুঁজি সংহত করে উপনিবেশ ছেড়ে মেট্রোপলিটনে চলে যাওয়া, যাকে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা নাম দেবেন। এই প্রকল্প দীর্ঘকাল চালানোর জন্যে উপনিবেশিক প্রকল্পে অভিজাত আর ভদ্রবিত্তকে সামিল করা হল। উদ্দেশ্য ছেড়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের হয়ে বকলমে ইওরপোএর স্বার্থ দেখার জোয়াল কাঁধে তুলে নেবে। এই কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল মুলারীয় আর্যতত্ত্ব।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উপনিবেশ রক্ষায় প্রাচ্যভাষা চর্চা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। অর্থ মন্ত্রকের সহসচিব চার্লস ট্রেভলিয়ন, ম্যাক্সমুলারের থেকে তুর্কি সাম্রাজ্যের উত্তর অঞ্চলের ভাষা, ব্যকরণ চর্চার প্রস্তাব চাইলেন। ১৮৫৪র ১৬মে মুলার প্রস্তাব দিলেন, 'ইংল্যান্ড প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নে উৎসাহ দিক; উপযুক্ত সময় উপস্থিত ...প্রাচ্যের সাথে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় সংযোগ থাকা দেশে, সরকার বা যুবকদের এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হোক। প্রাচ্যের সাথে (প্রাতীচ্যের) অবাধ মিলনের স্বার্থ জড়ানো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পাঠ, ইংল্যান্ডে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজকে উৎসাহ দেওয়া হয় না।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই প্রথম বিধবদ্ধভাবে পূর্ব দেশগুলোর সমাজ চর্চার উদ্যম শুরু হল।

মুলারের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে প্রায় তিন দশক কেটে যাবে। ১৮৯০তে লন্ডনে খোলা হল প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ। মুলার যে সে সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি করতেন সে উদাহরণ তার উদ্বোধনী বক্তৃতা আর চিঠিপত্র সূত্রে স্পষ্ট আন্দাজ করা যায়। বক্তৃতায় তিনি ক্রিমিয়া যুদ্ধ, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাঠদানের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৮৫র এক চিঠিতে উপনিবেশের গুণ গেয়ে সম্ভাব্য রুশ আগ্রাসন বিষয়ে লিখবেন, 'ইংল্যান্ড আর উপনিবেশগুলির মধ্যে ঈর্ষার সম্পর্ক ছিল; কখনও কখনও সে ঈর্ষা চরম আকারও ধারণ করেছে; তবুও আজ উপনিবেশিক প্রজারা তার শত্রুকে, রক্ষক মেট্রোপলিটন ইংল্যান্ডের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দিতে রাজি না। যে ভারতবর্ষ ইংলন্ডের জন্যে বিপজ্জনক উপনিবেশ ছিল, এখন সে দেখছে ইংল্যান্ডের শত্রুরা তার শত্রু।' মুলার বললেন ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচার প্রয়োজন সাম্রাজ্য স্বার্থ পূরণ করতে। একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের অস্তিত্ব আছে। ১৮৯১এর গিফোর্ড বক্তৃতায় বললেন বৈদিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছে ১৫০০ খ্রিপূ থেকে ১০০ খ্রিপূতে, 'বহু শাস্ত্রীয় পণ্ডিত সংস্কৃতকে অবাঞ্ছিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেন এবং সংস্কৃতকে গালাগালি করা বিভিন্ন মহলে স্বাগত জানানো হয়; অনেকেই নতুন ভাষা শেখার ঝামেলা অপছন্দ।' আমরা দেখলাম আর্যতত্ত্বীয় প্রাচ্যবাদী উদ্যম শুরুতে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্যোগে প্রাচ্য ভাষাচর্চার মোড়কে যাত্রা শুরু করলেও সেই চর্চা শেষ অবদি সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে, সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ্য মদতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যাচর্চায় রূপান্তরিত হওয়ার ইঙ্গিত তুলে ধরছে।

আর্যতত্ত্ব নখ দাঁত বিসর্জনের রাজনীতি

আর্যতত্ত্বের রাজনীতি বুঝতে মুলারকে নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিকা প্রকাশ প্রয়োজন। অর্থদাতা শাসক প্রভুদের কথামত সাংস্কৃত ভাষা ঠিক মত অধ্যয়ন না করেই খগ্বেদ অনুবাদ প্রকাশ এবং আর্যতত্ত্বে ভারতীয়দের মাথা মুড়োনোর পর, তাঁর ধারণা হয়েছিল কোম্পানি সরকারের নির্দেশে (পরে ব্রিটিশ সরকার) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাঁকে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করবে। অক্সফোর্ডে তিনি ছিলেন আধুনিক ইওরোপিয় ভাষার অধ্যাপক। কিন্তু স্বপ্ন ছিল অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হওয়া। অক্সফোর্ডে সংস্কৃত বিভাগে সংস্কৃত শিক্ষকের পদের প্রাতিষ্ঠানিক নাম 'বোডিন প্রফেসরশিপ অব সংস্কৃত।' তৈরি হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে। ১৮৫৭র ভারতবর্ষ বিপ্লবে সাম্রাজ্য-প্রভু পাল্টে কোম্পানি শাসন নিষিদ্ধ হল। ভারতবর্ষের জাতীয়করণ সম্পন্ন হলে এল রাণীর ব্রিটিশ সরকার। নতুন সরকারে নতুন ক্ষমতার সমীকরণ, নতুন মুখ, পরিকল্পনার নবসাজ। কিন্তু দাসত্ব-প্রকল্প পথ পাল্টাল না।

নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার নতুনতর সমীকরণ সমাধান করলেন মুলারের স্বদেশিয় প্রতিদ্বন্দ্বী মনিয়ের মনিয়ের উইলিয়মস। ১৮৬০এ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে মনিয়ের 'বোডিন প্রফেসরশিপ অব সংস্কৃত' পদ দখল করলেন তিনি। মুলার পেলেন অক্সফোর্ডে তুলনামূলক দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার স্বান্ত্বনা পুরস্কার। সাম্রাজ্য সেবক মুলার এতই ক্ষিপ্ত যে নতুন প্রভুকে শিক্ষা দিতে প্রিয়তম সন্তান, আর্যতত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস করলেন যাতে ক্ষমতাশালীরা আর্যতত্ত্ব ব্যবহার করতে না পারে। তিনি বললেন, 'আমি বারবার বলেছি, আমি আর্য বোঝাতে রক্ত, হাড়, চুল, মাথার খুলি বোঝাই নি, আমি কেবল বুঝিয়েছি আর্য ভাষায় কথা বলা মানুষজনকে... আমার কাছে আর্য জাতি আর তার চুল নিয়ে বাকতাল্লা করা জাতিতত্ত্ববাদীরা, ডোলিকোসেফালিক, ব্রাকিসেফালিক ডিক্সনারি, বা ব্রাকিসেফালিক গ্রামার নিয়ে আলোচনা করা পণ্ডিতদের মতই সমান পাপী।' কিন্তু হায়! তত্ত্ব হিসেবে ঠিক হোক বা ভুল, আর্যতত্ত্বের জাতি-সৌরভ পৌঁছে গেছে ক্ষমতাশালীদের তাঁবেতে। তারা আর্যতত্ত্বকে তুলে নিলেন সাম্রাজ্য স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে।

মুলারের আর্যতত্ব গুরুত্ব হ্রাসে তার ব্যক্তিগত স্বার্থহানির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সে সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীও। ১৮৭১এর আগে জার্মানি ছিল ছোট ছোট জমিদারির সমাবেশ। জার্মান জাতিরাষ্ট্র বলতে একবিংশ শতকে ক্ষমতাশালী ভৌগোলিক অবস্থান, আন্তর্জাতিক ক্ষমতাদর্প বুঝি, উনবিংশ শতকে জার্মানির সে ক্ষমতা ছিল না। জার্মান মানচিত্র বলতে বিন্দুরমত কয়েকটি ছড়ানো ছিটোনো জমিদারি। ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো - বিশেষ করে অস্ট্রিয়া

বিসমার্ক

আর ফ্রান্স নেপোলিয়নের ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময় থেকেই, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় জার্মানিকে দুটো ভাগে ভাগ করবে। মাঝে মাঝে জার্মানির প্রজাদের অবাঞ্ছিত মনে করে এই দুই রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ত জার্মানির সীমান্ত নিরাপত্তা পাত্তা না দিয়ে। সে সময় জার্মান প্রজারা মনে করত তার রাষ্ট্র আর সে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতের পুতুল। ক্রমশঃ পরাধীনতার অপমানবোধ ছড়িয়ে পড়ে জার্মান জনগণের মধ্যে। আহত মানসিকতা আগামীদিনে শুধু ইওরোপে নয়, বিশ্ব ইতিহাসে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। ঘটবে হিটলারের উত্থান। এমত ভারতের জনগণেরমত প্রায়পরাধীন দলিত জার্মান বুদ্ধিজীবিরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আকর্ষিত হলেন। জার্মানিতে শিক্ষিতদের মধ্যে ভারতবর্ষ ভাষা, সাহিত্যচর্চা আবশ্যিক শিক্ষায় পরিণত হয়। জার্মানি সংযুক্তির পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যর পরামর্শদাতার বক্তব্য ছিল - 'সংস্কৃত চর্চার মধ্যে দিয়ে একটি জাতি তৈরি হল।' হামবোল্ট, ফ্রেড্রিক এবং উইলহেম শ্লেগেল, শোপেনহাওয়ারএরমত চিন্তাবিদেরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য, দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে কাজের অনুপ্রেরণা অর্জন করলেন। কালিদাসের শকুন্তলা ইওরোপে প্রথম অনুবাদ হল জার্মান ভাষায়। পরাজিত জার্মান জনগণের জীবনে আর্য শব্দ মুক্তি বয়ে আনছে। আর্য শব্দের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার রেশ খুঁজে পাচ্ছে তারা। আর্য শব্দ জার্মান রাজনীতিকদের সবথেকে প্রিয় উচ্চারণ। বিসমার্ক প্রতি বক্তৃতায় সগর্বে আর্য শব্দ ব্যবহার করে জার্মানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা জাগিয়ে তুলছেন।

ইওরোপে আর্য যুগের উত্থানকালে দুই সমকালীন প্রখ্যাত জার্মান কার্ল মার্ক্স আর ম্যাক্সমুলার ভাগ্য ফেরাতে বিশ্ব লুঠ কেন্দ্র কোকটাউন ব্রিটেনে অভিবাসিত হচ্ছেন। ১৮৫৭এর তীব্র ধাক্কায় সাম্রাজ্য হারাতে বসার দুর্দমনীয় অভিজ্ঞতার পর ব্রিটেন ইওরোপিয় রাজনীতিতে মেপে পা ফেলছে। ১৮৭১এ জার্মানির সংযুক্তিকরণের প্রভাবে ব্রিটেনের সংবাদপত্র জগত জার্মানির উদ্দেশ্যে বিষবাষ্পের জাল ছড়িয়ে ব্রিটেনে জার্মানগন্ধী সবকিছুই সন্দেহের নজরে। জার্মানির সংযুক্তিকরণের পর ব্রিটেনে সব থেকে ঘৃণিত ইওরোপিয় রাজনীতিকের নাম বিসমার্ক। সব থেকে ঘৃণিত রাজনৈতিক শব্দ আর্য - যদিও আর্যতত্ত্ব তার ভারতবর্ষ উপনিবেশ রক্ষার হাতিয়ার।

ম্যাক্সমুলার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিচিততম মুখ, ব্রিটিশ আর্যতত্ত্বের ভিত্তিদাতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানির বিপুল বিনিয়োগে লালিত পালিত মুলারের পক্ষে জার্মানপক্ষীয় অবস্থান নেওয়া কেরিয়ারের গোড়ায় কুড়ুল মারার সামিল। আশংকা ব্রিটিশ রাজনীতিক, প্রশাসক তার আর্যতত্ত্ব আর বিসমার্কের বক্তৃতায় ব্যবহার করা আর্য শব্দ, বাড়তে থাকা জার্মান জাতীয়তাবোধের সঙ্গে একাত্মকরে দেখতে চাইলেই চিত্তির। বিশ্ব রাজনীতি তুল্যমূল্য বিচার করে স্বস্বার্থ রক্ষায় ম্যাক্সমুলার কন্যাসম

আর্যতত্ত্বের গুরুত্ব বিনাশের গুরু-সিদ্ধান্ত নিলেন।

একই সঙ্গে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জুড়তে হবে মনিয়ের মনিয়ের উইলিয়মসএর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বডিন অধ্যাপকপদে বৃত হওয়ার ঘটনা। ব্যক্তিগত জীবনে স্বপ্নপূরণ না হওয়ার হাহাকার, তৎকালীন ইওরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষাক্ত সমীকরণ, ইংলন্ডে তার বিরুদ্ধে যাওয়া প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রভাব সামলাতে মুলার কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। কেরিয়ারের প্রথম থেকেই অর্থবান হওয়া, প্রখ্যাত হওয়া আর বারংবার সংবাদশীর্ষে থাকা ছিল তাঁর প্রথম এবং প্রধানতম লক্ষ্য। সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আর্যতত্ব তাকে খ্যাতি এনে দিল ঠিকই, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন আর্যতত্ব তার সফলতম কেরিয়ারে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে, তখন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে যে তত্বে তার বিশ্ব জয়, সেই তত্ত্বের মূল কেটে নির্বিষ শব্দ-সর্পে রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে আঁচ করা সম্ভব হয় নি, ততদিনে সাম্রাজ্য কর্তৃপক্ষ, উপনিবেশ রক্ষায় আর্যতত্ত্বের প্রয়োগবাদী সৌরভটি আঁচ করতে পেরেছে। আর্যতত্ত্বের উদ্গাতা, তত্ত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্যম নিলেও, দেখা গেল এই রাজনৈতিক বোমাটির আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

আর্যতত্ত্ব এবং উনবিংশ শতে ইওরোপিয় জ্ঞানবিশ্ব

উনবিংশ শতে ইওরোপিয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশ্বে বদল আসছে। বিশ্বায়িত সাম্রাজ্যে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থার শেকড় চারানোর জন্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বে পরিবর্তন আসতে শুরু করল। চার্লস লায়েল ১৮৩০এ আনলেন 'প্রিন্সিপলস অব জিওলজি' তত্ত্ব। ১৮৫৯এ এল চার্লস ডারউইনের দ্য অরিজিন অব স্পেসিস। ১৮৫৩য় ফরাসি অভিজাত আর্থার গোবিন্যু ফ্রান্স জার্মানিতে প্রকাশ করলেন 'এন এসে অন দ্য ইনইকুয়ালিটি অব হিউম্যান রেস।' একের পর এক বক্তৃতায় বললেন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রঙের মানুষের বিকাশ ঘটেছে। তাঁর polygenism তত্ত্ব আর্যতত্ত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বৈজ্ঞানিক জাতিবাদের 'বিজ্ঞান'ভিত্তিক সময়ের সূচনা হল আর্থার গোবিন্যুর তত্ত্বে। এর কয়েক দশক আগে ১৮৩৯এ আমেরিকায় স্যামুয়েল জর্জ মর্টন 'ক্রানিয়া আমেরিকানা' প্রকাশ করে 'বৈজ্ঞানিক জাতিবাদ'এর সূচনা করেছেন যার মাধ্যমে জাতির মাথার খুলির মাপে সমাজের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি বিচার করার তত্ত্ব এল। মর্টনের তত্ত্বে ভিত্তি করে ১৮৬৩তে লন্ডনে এন্থ্রোপলজিক্যাল সোসাইটির জন্ম হবে। জাতিবাদী, নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব সমাহারে 'বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমান' করা হল উচ্চ মাথা, উচ্চ কদ, উচ্চ নাসা এবং ফর্সা ত্বকের নর্ডিকেরাই বিশ্বের একমাত্র বুদ্ধিমন্ত জাতি। তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্বগুলো এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকায় ইওরোপিয় প্রাধান্য, সাম্রাজ্য বিস্তারে হাতিয়ার হল।

১৭৮৬তে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্যবাদীদের মহাগুরু উইলিয়াম জোনস সোসাইটির তৃতীয় বর্ষ উদযাপন সভায় বললেন, 'সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু ভাষার কাঠামো বিস্ময়কর, গ্রীক ভাষার চেয়েও নিখুঁত, ল্যাটিনের চেয়েও তথ্যবহুল, দুটোর চেয়েও পরিমার্জিত; ক্রিয়াপদের ধাতু, ব্যাকরণ কাঠামোয় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রিক আর ল্যাটিনের অপূর্ব মিল হয়ত আপতিক, কিন্তু বিষয়টা আমার মনে দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে; এখনও পর্যন্ত কোনো দার্শনিকই তিন ভাষার মিল পরীক্ষা করেননি, তাঁরা বিশ্বাসই করেন না তিন ভাষা একটিই সাধারণ সূত্র থেকে আবির্ভূত হয়েছে। এবং সম্ভবত সেই প্রমাণ আর টিকে নেই।' আমরা ম্যাক্সমুলারের মত উইলিয়াম জোনসের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছি - যদিও এই বইতে বিশদে আলোচনার সুযোগ নেই। জোনসের বহু আগেই ইওরোপিয় ভাষা তাত্ত্বিকেরা সংস্কৃত ভাষাকে প্রাচীন ইন্দো-ইরানিয় ভাষা হিসেবে অভিহিত করেছেন। অথচ আমরা ভুলে যাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আগে মুঘল দরবারে বেদ চর্চা করেছেন শাহজাহান পুত্র দারা শুকো। জোনস যখন সংস্কৃত ভাষা নিয়ে মাতামাতি করছেন, তখন তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় শিক্ষানিবিশও নন, অথচ তিনি সংস্কৃত ভাষাকে ইন্দো-ইরানিয় বর্গ থেকে সরিয়ে ইন্দো-ইওরোপিয় বর্গে স্থাপন করলেন।

জোনসের এই বক্তৃতার প্রায় ৮০ বছর পর পার হয়েছে। সিপাহি স্বাধীনতার যুদ্ধের পর মুলার অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হতে পারেন নি। ১৮৬১তে রয়াল ইনসটিটিউশন ইন গ্রেট ব্রিটেনের বক্তৃতায় আর্য শব্দকে নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন, 'ভাবুন আর্য জাতির পূর্বপুরুষ কৃষি যাযাবররা কেন সেই নাম বেছে নিয়েছিলেন।' বক্তৃতায় তিনি কৃষিজীবী যাযাবর আর্যদের বিষয়ে বলতে গিয়ে স্পষ্টভাবে 'আর্য জাতি' ছাড়াও 'আর্য উপভাষা', 'আর্য ক্রিয়া', 'আর্য বুলি' এবং 'আর্য ভাষা' শব্দবন্ধও ব্যবহার করলেন। মুলার বললেন, 'যেমন পারস্যে আমরা অনেকগুলি ব্যক্তিনাম (প্রপার নেম) খুঁজে পেয়েছি যে নামে আর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একইভাবে আমরা জার্মান ইতিহাসের অ্যারিওভিস্টাস নাম নতুন করে খুঁজে পেয়েছি [যে নামেও আর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান]' And as in Persia we found many proper names in which Arya formed an important ingredient, so we find again in German history names such as Ariovistus। মুলার এই ইন্টারেস্টিং পাদটিকা কোনও দিনই আলোচনায় আসে নি, - বুৎপত্তিগতভাবে এই যোগ আপতিক, বাস্তব জীবনে প্রমান করা দুঃসাধ্য। সমস্যা হল তাঁর এই বক্তব্য পাদটিকা হয়েই থেকেছে মূল আলোচনায় ব্রাত্য থেকেছে। নরমে গরমে আর্যতত্ত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা প্রকল্পের ভিত্তি হিসেবে শেকড় গজাতে শুরু করল।

রোমান্টিক জার্মান জাতীয়তাবাদ আর আর্যতত্ত্ব

ইওরোপে লুঠেরা শিল্পায়ন আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়ায় জার্মান কবি, প্রাচ্যবিদ, দার্শনিক উইলহ্যাম শ্লেগেল জার্মান জাতীয়তাবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সূচনা করলেন। গ্রিম ভাইদের লোককথা সংগ্রহ প্রকাশ হল। ১৮৩৬এ গুস্তাফ ক্লেম 'হ্যান্ডবুক অব জার্মান এন্টিকুইটি'তে প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে জার্মানির কৃষ্টির মিল দেখালেন। শ্লেগেল আর্য মিথ জানতেন, 'অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড উইসডম অব ইন্ডিয়া' বইতে আর্য শব্দের শেকড় খুঁজলেন; জুলিয়াস সিজারের 'কমেন্টস অন দ্য গ্যালিক ওয়ার্স'এর জার্মানজাত আরিওভিস্টাস শব্দে। তার ধারণা হল 'Ario' আরিও শব্দ জার্মান 'ehre' আহ্‌র বা আর্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে থাকা। Polygenism ফিজিক্যাল এন্থ্রোপলজিস্টদের প্রমান, রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ আর ইওরোপিয় রাজনীতির ঘোরতর ককটেলে সিপাহি উপসর্গের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায় আর্যতত্ত্ব থানাগাড়ল।

আর্য-বাসভূমি

আর্যদের ইতিহাস তৈরি হল। প্রশ্ন উঠল আর্যদের ভূগোল অর্থাৎ বাসস্থান কোথায়? নতুন সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানচর্চা, নৃতত্ত্বের 'বৈজ্ঞানিক প্রমান' অনুসারে জার্মান, পশ্চিম রুশ আর স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশ প্রাচীন আর্য জাতির বাসস্থানের দাবি জানাচ্ছিল। এই দাবির মান্যতা দিলে পশ্চিম ইওরোপিয় জার্মান জাতীয়তাবাদই হোক আর ব্রিটেনের দক্ষিণ পশ্চিম এশিয় সাম্রাজ্য রক্ষাই হোক, জোরদার হয় না। এর কাছাকাছি ভারতবর্ষ কোথায়? ভারতবর্ষীয় চাষীদের লুঠে পালিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাত্ত্বিক অবস্থান বিপদে পড়ে। সাম্রাজ্য স্বার্থ রক্ষায় মুলার তুললেন অভিবাসন তত্ত্ব 'এশিয় আর্যরা দুটি রাস্তা ধরে পশ্চিমে অভিবাসিত হল।' অর্থাৎ আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন অভিবাসিত হয়েছিল, তেমনি তারা ভারতবর্ষ থেকে আরও পশ্চিম অর্থাৎ ইওরোপের দিকে যাত্রা করেছিল। যাত্রার আরও একটা উপপাদ্য তৈরি হল। পশ্চিমের দিকের অভিবাসনের দুটি শাখা হল - এক দলকে পাঠালেন তাঁর জন্ম দেশ জার্মানিতে উনবিংশ-বিংশ শতকের জার্মান আর্য জাতীয়তাবাদ পুষ্ট করতে, আর অন্য দলকে পাঠালেন কর্মস্থল ব্রিটেনে যাতে আর্যতত্ত্ব ব্যবহার করে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল অটুট রাখতে পারে, তাঁর কেরিয়ারও রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আর্যদের জার্মান যাওয়ার তথ্যের থেকে জরুরি প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্য রক্ষায় আর্যদের ব্রিটেন অভিবাসন তত্ত্ব। না হলে কী করে বোঝানো যাবে ভারতবর্ষে শাসন করা ইংরেজরা সেই সুদূর সময়ে ভারত ছেড়ে যাওয়া ককেসাসিয়! এই উপপাদ্য ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার রাজনীতিতে খাপে খাপ খেয়ে গেল।

জার্মানেরা তখনও ইওরোপে দলিত রাষ্ট্র এবং জাতি। জার্মানজাত কবি সাহিত্যিক দার্শনিক রাজনৈতিক মুক্তি চান, একই সঙ্গে প্রাচীন আর্যত্বের গর্বও চান। তাদের আর্য চুষিকাঠি মুলার ধরিয়ে দিলেও প্রধান সমস্যা, রাষ্ট্র কই? তাই তাদের আহত সত্ত্বা ভারতবর্ষের পরাধীনতায় নিজের পরাধীন, ছন্নছাড়া অবস্থার মিল খুঁজে পেল। আহত জার্মান সত্ত্বা আর আর্যত্ব মিলেমিশে আগামী কয়েক দশক শুধু ইওরোপ নয় বিশ্ব রাজনীতির নির্ণায়ক তত্ত্ব হবে। ইংলন্ড তো তখনই স্বাভাবিকভাবে বিশ্বরাজনীতির মোড়ল। প্রত্যেকটি ইওরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ছেড়ে আসা উপনিবেশ কব্জা করে ব্রিটেন বিশ্বের এক নম্বর রাজা। আর জার্মানরা কোণঠাসা।

মাথায় রাখতে হবে সে সময় দুই বিখ্যাততম জার্মান ইংলন্ডে অভিবাসিত হচ্ছেন, প্রথমজন ফ্রেড্রিক ম্যাক্সমুলার যার রাজনীতি আমরা আগেই আলোচনা করেছি; দ্বিতীয়জন কার্ল মার্ক্স; দুজনই প্রথম জীবনে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে বসে ইওরোপিয় সাম্রাজ্যবাদকে মুক্তির পথ হিসেবে গণ্য করবেন। ১৮৫৩ থেকে মার্ক্স, আমেরিকার সংবাদপত্র নিউ ইউইর্ক ডেইলি ট্রিবিউনে আর্য তত্ত্বের স্বরে পতনশীল এশিয়ার 'প্রাচ্যবাদী একনায়কতন্ত্র' ব্যবস্থাপনার সমালোচক আর ব্যাখ্যাকার হবেন এবং স্বদেশিয় মুলারের স্বরেই বলবেন ইওরোপিয় সাম্রাজ্য ভারতভূমির মূঢ়, অজ্ঞ, সভ্যতার ঐশ্বর্য না দেখা শতাব্দের পর শতাব্দ অন্ধকারে ডুবে থাকা জনগণকে সামন্ততন্ত্রের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবে। ভারতবর্ষের হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্য তাকে ফিরিয়ে দিতে ইওরোপিয় সাম্রাজ্য বদ্ধ পরিকর। দুই ডান-বাম জার্মানের [এক জার্মানের হাতে প্রত্যক্ষ অন্য জার্মানের হাতে পরোক্ষ] তত্ত্বে তৈরি হল ব্রিটিশ প্রণোদিত আর্য রাজনীতির আন্তর্জাতিক ভিত।

উপনিবেশিক বাঙলা - ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব

পলাশী উত্তর সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছোট তরফের সঙ্গী হয়ে, ব্রিটিশ কোম্পানির গোমস্তা হিসেবে বাংলাজোড়া বিশিল্পায়ন, সম্পদ লুঠ, ছিয়াত্তরের গণহত্যায় হাত রাঙিয়ে বর্ণময় দাদনি বণিক, দালাদের উত্তরাধিকারীরা বাংলা লুঠের ধন চিৎপাতে দিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিপুল অর্থ ব্যয়ে জমিদারি কিনে। গোমস্তারা ব্রিটিশ কোম্পানির নির্দেশে বাংলার চাষী হকার কারিগরদের বিশ্ববাজার এবং বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করবেন। শান্তিপুর, ঘাটাল, ঢাকা, চন্দ্রকোনার মত আড়ংএর কারিগরেরা ব্রিটিশ আমলা বাঙালি গোমস্তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোম্পানিকে বিফল ডেপুটেশন দিয়ে, নিজেদের কাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে চাষে জুতে যেতে বাধ্য হলেন। মেদিনীপুর আর সন্দ্বীপের লবণ কারিগর বণিকদের উচ্ছেদ করা হল। জাহাজ শিল্প ধ্বংস করা হল। গর্বের লোহা শিল্প অস্তাচলে গেল। বহু কারিগরি শিল্প বন্ধ

হয়ে উচ্ছেদ হওয়া বিপুল কাজ হারানো কারিগর দেশ ছেড়ে কুলি হয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মরিসাস, আফ্রিকার নানান অঞ্চলে ইওরোপিয়দের বাগিচার চুক্তিবদ্ধ দাস হয়ে। বিশিল্পায়নের নীতিতে ১৮২০তে ঢাকা জনশূন্য হল। ইওরোপিয় শিল্পায়নের চক্করে নবজাগরিত বাঙালিদের চেষ্টায় বাংলার কারিগরদের কাজ গেল; বাংলার বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম সাহারা পরম্পরার পাঠশালা ব্যবস্থা ধ্বংস হল। হেস্টিংসের উদ্যোগে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার আইন করে কেড়ে নেওয়া হল মহিলাদের সতীতে চিতায় চড়ানোর প্রাক্টিক্যাল হুমকি দিয়ে। প্রত্যেকটি সাম্রাজ্য প্রকল্প মন দিয়ে রূপায়ণ করলেন ব্রিটিশ সবর্ণ কোলাবরেটরেরা। অমিয় কুমার বাগচী তত্ত্বে ২৫ জিডিপির বাংলার বিকেন্দ্রিভূত হকার কারিগর চাষী নির্ভর উৎপাদন কাঠামো ধ্বংসে, সম্পদ লুঠে, ইওরোপিয় কর্পোরেট কাঠামো তৈরির স্বার্থে জুড়ে থেকে নবজাগরিত ভদ্রবিত্ত উপহার পেলেন খণ্ডিত জমিদারি, লুঠ হওয়া পারিবারিক সম্পদ, কোম্পানির খিদমতে আভূমিনত দালালি, সাহেবদের চাটুপটু উমদোরি, এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকা লুঠে ইওরোপে জমতে থাকা পুঁজি বাড়াবার কাজে রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট কলুরবলদের চাকরি, উমদোরি আর দালালি। দাদনি বণিকদের উৎসাহে, দাদনি বণিকদের নবজাগরিত উত্তরাধিকারীদের প্রত্যক্ষ মদত নিয়ে পলাশীর পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিকল্পনায় প্রথমে বাংলা পরে ভারতভূমিজুড়ে শুরু হবে বিশ্বের প্রথম ১৯০ বছরের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি।

এই স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসির প্রথম দিককার কাজ দেখি উইলিয়াম জোনসের হাতে কাবাব (কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য) ভদ্রবিত্তের পুনর্বাসন। আরেকটি কম্পোনেন্ট ছিল মহিলাদের ক্ষমতা আর রোজগার কেড়ে নেওয়া। বাংলায় স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি রূপায়ণের দায়িত্ব পাওয়া উপনিবেশিক শাসক হেস্টিংস, হ্যালহেদকে আইন প্রণয়ণের দায়িত্ব দিয়ে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কাড়ার আইন তৈরির নির্দেশ দিলেন। উপনিবেশ পূর্ব বাংলায় বর্ণহিন্দু সমাজে মাতা, কন্যার সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত ছিল। প্রত্যেক ভ্রাতা ভগিনীকে তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ দিতে হত। ভগ্নী ৪ জন ভ্রাতা ১ জন হলে ভ্রাতার অধিকার শুন্য হয়। মনুর ছয় আর জিমূতবাহনের আট প্রকার স্ত্রীধন মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা স্ত্রীধনে অধিকার থাকত না। পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যার সমান ভাগ ছিল স্ত্রীধনে।

বাঙলার তাঁতের এবং সার্বিক কারিগরি ব্যবস্থার পতন, যাকে আমরা বাংলার বিশিল্পায়ন নামে অভিহিত করছি, সেই ধারণাটি বুঝতে বাঙালি মহিলাদের ক্ষমতা হারানোর ইতিহাস জানতে, বুঝতে হবে (আশাকরি বিষয়টা নিয়ে আমরা আগামী কোনও এক সংখ্যার পুথিতে বিশদে আলোচনা করব)। মনে রাখতে হবে

উপনিবেশপূর্ব সময়ে বাংলায় চাষ, হকারি এবং কারিগরি ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল বিপুল পরিমাণে। জন পরিসরে মহিলাদের ভূমিকা অসামান্য ছিল। সেই স্বাধীনতা উচ্চবর্ণের তথাকথিত রক্ষণীয়া মহিলাদের জীবনেও ঘটেছে। উপনিবেশপূর্ব সমাজে মহিলাদের সম্পত্তি, রোজগার, সমাজ ব্যবস্থাপনার অধিকারটুকু কেড়ে উপনিবেশ মহিলাদের গৃহবন্দী করল বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত নবজাগরণীয় আর্য অভিধায় গর্বিত ভদ্রবিত্ত পুরুষদের সহায়তায়। মহিলাদের জন্যে সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যতটুকু ফাঁকফোকোর ছিল সে সব বুজিয়ে, অধিকার ছিনিয়ে সমাজ হয়ে উঠল চরমতম পুরুষতান্ত্রিক, জাতিবাদী। আগের স্তবকেই আমরা দেখেছি বাংলায় ব্রিটিশ শাসন শুরুর আগে, আধুনিক ভারতে চরম নিন্দিত স্মৃতিকার মনু এবং জিমুতবাহন বাঙলার মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এমন কী বিধবাদের ক্ষেত্রেও। বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তিতে স্বামীরও হক ছিল না। বাংলার মহিলাদের সম্পত্তি এবং অন্যান্য স্বাভাবিক অধিকার কেড়ে নিল উপনিবেশিক প্রশাসক জোনস-হ্যালহেদ-হেস্টিংস-কোলব্রুক।

মহিলাদের ক্ষমতা হরণের পরম্পরার দর্শনে তৈরি হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের তত্ত্বায়ন। তারা মনে করে না মহিলাদের জনপরিসরে অবদান থাকা উচিৎ - সংঘের ১০০ বছরের ইতিহাসে মহিলা-প্রধান হওয়ার নিদর্শন নেই। সংঘ নেতা কৃষ্ণ গোপালের দাবি মহিলারা ঈশ্বরের প্রতিভূ, কিন্তু সংঘ পুরুষদের জন্যে সংরক্ষিত, মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিষদ্ধ। কিন্তু এই প্রবন্ধে বিশদে বলার সুযোগ নেই; পাঠককে অনুরোধ করব রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি [সংঘ নয় কিন্তু] বা সঙ্ঘী প্রচারিকা নিয়ে চারটে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পড়তে প্রমা রায়চৌধুরীর 'কম্প্রিহেন্ডিং দ্য প্রচারিকা, আ স্টাডি অব সোসাল অব্জেক্টিভিটিজ অব দ্য রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি', আদিত্য নিগমের 'হিন্দুত্ব, কাস্ট এন্ড দ্য 'ন্যাশনাল আনকনসাসনেস', তনিকা সরকারের, 'দ্য ওমেন এজ কমিউনাল সাব্জেক্টস - রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি এন্ড রামজন্মভূমি মুভমেন্ট' আর রত্না কাপুর, ব্রেন্দা কসম্যানের 'কমিউনালাইজিং জেন্ডার/এন্ডেজারিং কমিউনিটি - ওমেন, লিগাল ডিসকোর্স এন্ড স্যাফ্রন এজেন্ডা'।

বাংলার প্রেক্ষিতে এই ক্ষমতা হরণের স্তরগুলি আরও বিশদে বর্ণনা রয়েছে কলাবতী মুদ্রা প্রকাশিত দেবোত্তম চক্রবর্তী 'বিদ্যাসাগর - নির্মাণ বিনির্মাণ পুনর্নির্মাণের আখ্যান' বইতে (পাঞ্জাবে মহিলা কৃষকদের ক্ষমতা হারানোর প্রক্রিয়া বুঝতে বীণা তলোয়ারের 'ডাউরি মার্ডার' এবং নীলাদ্রি ভট্টাচার্যের 'দ্য গ্রেট এগ্রারিয়ান কনকুয়েস্ট' পড়া দরকার)। দেবোত্তম লিখছেন

১. মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ঊর্ধ্বং পিতুশ্চ

মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্। ভজেরন্ পৈতৃকং রিকথ্মনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। ৯. ১০৪ অর্থাৎ পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবে; কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রগণ [সম্পত্তির] অধিকারী নয়।

২. মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৯৪ সংখ্যক শ্লোকে 'স্ত্রীধন'সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে মনু বলেছেন: অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি। ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্। অর্থাৎ স্ত্রীধন [অন্ততপক্ষে] ছ'টি সূত্রে অর্জিত হতে পারে - অধ্যগ্নি (বিবাহের সময়ে পিত্রাদিদত্ত ধন), অধ্যাবাহনিক (পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহ গমনের সময় স্ত্রীর লব্ধ ধন), প্রীতিদত্ত (বিবাহের সময়ে ও পরে স্বামী ও অন্যদের দেওয়া নানা উপহার) এবং যে কোনও সময়ে ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত উপহার।

৩. এই স্ত্রীধন নারীরা আমৃত্যু তাঁদের নিজস্ব সম্পদরূপে রেখে দিতে পারতেন। কেবল মাতার মৃত্যুর পরেই, তাঁর পুত্রকন্যারা সেই স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হতে পারত। এই কারণে স্ত্রীধনই ছিল বিধবাদের রক্ষাকবচ। স্বামীর মৃতুর পরে বিধবাদের আর্থিক দুর্দশা লাঘবের জন্য মনু যে বিধান দিয়েছিলেন, তা হল - পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ। ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে।। ৯. ২০০ অর্থাৎ পতির জীবদ্দশায় স্ত্রী তাঁর অনুমতিতে যে অলংকার ধারণ করবেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তা উত্তরাধিকারীরা ভাগ করতে পারবে না। করলে তারা পতিত হবে।

শাসক হেস্টিংস, বাঙলা না জেনে বাঙলা ব্যকরণ রচনা করা প্রাচ্যবিদ হ্যালহেদ আর কেরি [সংস্কৃত প্রায় না জেনে ভাষাতাত্ত্বিক জোনস আর ঋগ্বেদ অনুবাদক মুলার], বিচারক জোন্স, সিভিলিয়ান কোলব্রুক মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিতে ভদ্রলোকদের লেলিয়ে বাংলায় সতীদাহ উৎসব শুরু করালেন। বাংলা, সংস্কৃত ভাষা না জানা হ্যালহেদকে দেওয়া হল আইন প্রণয়নের দায়। তাঁর নিদান হল 'নারী স্বভাবে দুষ্টই হোক, স্বভাবে বিনয়ীই হোক, সম্পত্তির প্রতি উদাসীনই হোক, অসতীই হোক, নারী সম্পত্তি বলে যে জিনিসটা আমরা জানি, সে নিজ অধিকারে রাখতে সে অক্ষম' WHATEVER Woman be of a Disposition altogether malevolent, or wanting in female Modesty, or careless of her Property, or unchaste, such Woman is incapable of possessing what has been specified to be a Woman's Property। বিধবাদের 'সতীত্ব'রক্ষা করার নিখাদ পুরুষতান্ত্রিক অছিলায়, মহিলাদের সম্পত্তি বঞ্চিত করার যুগ শুরু হল। হ্যালহেদের অনুবাদে, বাঙালী মহিলাদের বর্ণনা করা হল, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, কলহপ্রিয়, কামুক ইত্যাদি। হ্যালহেদ নিজে পরিচিত ওম্যানাইজার। তিনি বাঙালী মহিলাদের সম্পর্কে এই নিদান শাস্ত্রসম্মত বলে দাবী করলেন, এবং পরবর্তী সময়ে সেটাকেই স্যাক্রোস্যান্ট ধরে

নেওয়া হল It is proper for a Woman, after her Husband's Death, to burn herself in the Fire with his Corpse; every Woman, who thus burns herself, shall remain in Paradise with her Husband Three Crore and Fifty Lacks of Years.. if she cannot burn, she must, in that Case, preserve an inviolable Chastity-, if she remains always chaste, she goes to Paradise; and if she does not preserve her Chastity, she goes to hell… পরবর্তীতে এটাই স্থির জানা হয়ে গেল। এটাই যদি বিধান হবে, তাহলে, ১৭৭৬-এর আগের বাংলায় সতীদাহ তো দূরের কথা, নবাবকে ১ কোটি টাকা রাজস্ব দেওয়া বিধবা রাণী-রা কোথা থেকে এলেন, সেই প্রশ্নটাই উঠল না।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মহিলাদেরকে যোগদান আরও খাটো করে, সম্পত্তিতে তাঁদের অধিকার বাতিল করে, যতটুকু সামাজিক যোগদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উপনিবেশপূর্ব বাংলায় তৈরি হয়েছিল, সেটুকুকেও সমূল উৎপাটিত করা হল। হ্যালহেদ-এর ভায়া ফারসি, ইংরিজি অনুবাদের চোলাই থেকে উপনিবেশপূর্ব সময়ের মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের ছবি তৈরি করা হল। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের বল প্রয়োগে পোড়ানোর নিদান জারি হল। হেস্টিংস, হ্যালহেদ জোন্স, কোলব্রুক মূল কুশীলব। দুর্ভাগ্য আলোকপ্রাপ্ত নবজাগরণী মহিলা পুরুষ উভয়েই বিশ্বাস সতীদাহ একটি প্রাচ্যবাদী অভিচার, সতীদাহ থেকে বাংলা আর বাংলার মহিলাদের বাঁচিয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ।

বাংলার বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম ঘটক মহিলাদের রোজগার কেড়ে, তাদের অধিকাংশের জমিদারির অধিকার কেড়ে, সতীদাহ চালু করে সামাজিক ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করার কয়েক দশকের মধ্যে মসিহা সেজে সতীদের বাঁচাতে উপনিবেশিক শাসকদের উদ্যোগে রামমোহন রায় আসরে নামবেন। ইংরেজি শিখে ইওরোপিয় সমাজে সুদে টাকা খাটিয়ে প্রাধান্য পেলেন জমিদার পরিবারের সন্তান 'ডিগবির দেওয়ান' রামমোহন রায়। রামমোহনের সঙ্গে জুটলেন পৌত্তলিক শিষ্য বৈষ্ণব দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তার পুত্র ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠকুর। এই বঙ্গ এলিটদের হাত দিয়েই গোড়াপত্তন হবে ব্রাহ্ম সমাজের। ইতিমধ্যে মিশনারিরা উপনিবেশের সহায়ক হয়ে উপনিবেশে ধর্ম প্রচারে বাংলায় আসতে শুরু করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম দিকে কলকাতার বিখ্যাত কিছু পরিবারের সন্তান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গড়ে ওঠা এজেন্সি হাউসগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ নিয়ে ইংরেজ বাণিজ্যবিশ্বে ব্যবসা চালাত। ব্যবসার রোজগার ছিল ব্যবসায়ী ইংরেজদের লাভ-নির্ভর। নীল ব্যবসায় এজেন্সি হাউস নীলকরদের ১০ শতাংশ

হারে টাকা ধার দিত। ১৮২৩এর সরকার নতুন ধার নীতি প্রণয়ন করায় নীলকরদের ধার পেতে সুবিধে হল। এই নীতি বাঙলার নীলচাষকে আরও কয়েক দফা এগিয়ে দেয়। ১৮২৪এর ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধে সরকারের কোষাগারে টান ধরল। ইংলন্ডে বাঙলার কাঁচামালের দাম দারুণভাবে পড়তে শুরু করায় দেশিয় নীল (ইংরেজদের) ব্যবসার ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। ব্যবসায় মন্দা শুরু হয়। এজেন্সি হাউসের একটি বড় অংশ অর্থ নীলচাষে খাটছিল ১০ শতাংশ বাৎসরিক সুদে। বহু এজেন্সি বিনিয়োজিত অর্থ ফেরত দিতে পারছিল না। একের পর এক এজেন্সি হাউসে তালা ঝুলল। নীলকরেরা বিপদ অনুভব করে সরকারের কাছে দাবি জানাল, দাদন নিয়ে যেসব চাষী নীল সরবরাহ করার শর্ত পূরণ করছেনা তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। নীলকরদের দাবি মেনে নিল সরকার।

আর্মহার্স্টএর ষষ্ঠ নিয়মে, বিনিয়োজিত আসল, সুদ সমেত ফেরত পেতে নীলকরদের আইনের দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি মিলল। এতেও অত্যাচারী নীলকরদের মন ওঠেনা। চাই আরও কড়া নতুন আইন। তারা আর দাদন দিতে চায় না। ভারতে জমি কিনতে চায়, সরাসরি চাষ করতে চায় - যার নাম কলোনাইজেশন আন্দোলন। ১৮৩৩এর সনদে ব্রিটিশ নাগরিকদের ভারতে জমি কেনার অধিকার দেওয়ার অনেক আগে থেকেই কোলাবরেটর রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বড় জমিদারদের একাংশ এই আন্দোলনেজুড়ে ছিলেন, তারা নতুন করে বল পেলেন। ভারতবর্ষীয় ছোট জমিদারেরা এই দাবির বিরোধী। বড় জমিদারদের যুক্তি অবোধ, অসভ্য ভারতীয়রা সুসভ্য ইংরেজদের সংস্পর্শে সভ্য হবে, আর ব্যবসায়ী ইংরেজদের ব্যবসার দক্ষতার মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হবে। কলোনাইজেশন আন্দোলনের সফল হওয়ায় নব্যনবজাগরণী মহাতেজেদের প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্ম, উপনিবেশের শাসকদের কাছে অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্জন করল।

নেপলিয়নের পতনের পর ইওরোপের বাইরে থাকা প্রায় প্রত্যকটি মহাদেশের বড় অংশ ইংরেজদের পদতলে। ১৭৮০তেই ইউনিটেরিয়ানদের এডাম স্মিথ 'ওয়েলথ অব নেশন'এ মুক্ত বাণিজ্যে ডাক দিচ্ছেন। ১৮০৯ নাগাদ রিকার্ডিয়ান রেন্ট থিওরি-ও শেপ পাচ্ছে। ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের অর্থ অন্তঃত বাঙালিরা জেনে গিয়েছে পলাশির উত্তর ক্লাইভ-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসএর স্বেচ্ছাচারী লুঠেরা যুগলবন্দীতে। সাম্রাজ্য তখন সাত দশকও পেরোয়নি ইউনিটেরিয়ান রামমোহন-দ্বারকানাথ এদেশে ব্রিটিশারদের বাণিজ্যর জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেনার অধিকার দাবির পাশে দাঁড়ালেন। ইংলন্ডে ইউনিটেরিয়ানদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। নতুন শিল্পমালিকদের সামনে ভারতীয় উপনিবেশের কারিগরদের তৈরি বাজার দখলই মুক্ত বাণিজ্য। ১৮৩২র নতুন সংস্কার আইন আর ১৮৩৩র সনদ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের

বিরুদ্ধে ইউনিটেরিয়ানদের বড় জয়। বাংলায় নীলকরেরা জমি কেনার অধিকার পেল। ইওরোপিয় ব্যবসায়ীদের সাহায্যকারী জমিদার রামমোহন-দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম ক্রমশ কলকাতাস্থ অভিজাত ভদ্রলোকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হল।

নব্যনবজাগরণী মহাতেজেদের প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্ম, দল, গোষ্ঠী আরও ভারি হওয়ার আরও একটা কারন হল পরম্পরা ব্যবসায়ী আর ভূমি নির্ভর পরিবারগুলোয় প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্ভর জমিদার এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে জুড়ে থাকা অর্থবান বাঙালি, এজেন্সি হাউসগুলোয় বিনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৩০ এবং ১৮৪০ দশকে পর পর দুবার এজেন্সি হাউসগুলোর পতন ঘটায় বহু বাঙালি পুঁজি ডুবে যায়। ব্রিটিশ ব্যবস্থাজাত অনুপস্থিত জমিদারদের জমিদারিতে বিপুল পরিমান মধ্যসত্বভোগী শ্রেণী তৈরি হওয়ার ফলে, প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়া অসম্ভব হচ্ছিল। বাঙালির অভিজাত পরিবারের উত্তর প্রজন্মকে চাকরি, দালালিতে মন দিতে হল। চাকরি পেতে আর রক্ষা করার জন্যে দলবেঁধে কোম্পানির চাটুকারিতায় ব্রাহ্ম সমাজের মত দল আর গোষ্ঠীগুলোয় সদস্যপদ নিতে হচ্ছিল। দল বাড়াবার পরিবেশ তৈরি হল ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম ধর্ম পরিচালকদের।

ইংরেজ প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতা পেলে উপনিবেশে এক সাধারণ ভদ্রবিত্তের কোন পর্যায়ে উত্থান ঘটতে পারে তার প্রত্যক্ষ্য উদাহরণ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পূর্বজ রামকমল সেন। রামকমল সেন ১৮০০ থেকে তিন বছর কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট নেমীর কেরানী ছিলেন। ১৮০৪ থেকে উইলিয়ম হান্টারের হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে কম্পোজিটর, ১৮১১তে পরিচালক হলেন, সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা), সংস্কৃত কলেজের হিসাবরক্ষক। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট। ১৮২১এ রামকমল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করে এশিয়াটিক সোসাইটির উইলসনের অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে ১৮২৮এ টাঁকশালের দেওয়ান এবং ১৮৩২এ বেঙ্গল ব্যাংকের দেওয়ান। ১৮৩৮এ 'জমিদার সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

রামকমলের যখন কলকাতার শাসক কেষ্টুবিষ্টুদের সঙ্গে দিন রাত ওঠাবসা করছেন, ১৮৩০এর অগাস্টের গোড়ার দিকে কলকাতায় পাদ্রি হিলের প্রথম বক্তৃতা। বক্তা একে প্রণম্য ইওরোপিয় পাদ্রি, তায় বক্তৃতার বিষয় রাজার ধর্ম, [কলকাতার] হিন্দু সমাজের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। কলকাতার সমাজ কাঁপল ইয়ং বেঙ্গলিদের নতুন খ্যাদ্যাভ্যাসে। রায়বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক, 'কলিকাতার কথা'য় লিখছেন '...

হিন্দু কলেজের ছেলেরা হিনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং হেয়ার সাহেবের শিক্ষায় প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ও হিন্দুধর্মের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে লাগিল। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণ [মোহন] বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইল। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম [তখনও ধর্ম হয় নি] প্রচার করিলেন। সমাজে ও কলিকাতার হিন্দুধর্ম গেল গেল রব পড়িয়া গেল। রামকমল সেন হিন্দু কলেজ হইতে উক্ত ডিরোজিওকে ছাড়াইতে গেলেন, কিন্তু উইলসন, হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের (কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ) জন্য তাহা পারিলেন না। উক্ত সেনকে মিন্টের ও ব্যাঙ্কের দেওয়ান করিয়া কোম্পানি বশ করিয়া ফেলিল। ডিরোজিও নিজে ইহাদের ধন্যবাদ দিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। ..ডিরোজিওর ছাত্রেরা সকলেই কোম্পানির বড় চাকরীয়া ডিপুটি কলেক্টর হইল।'

সেন পরিবারের হরিমোহন সেন, কেশব সেন, মাধব সেন প্রভৃতি বাঙলার ভাগ্যাকাশে বহুদিন রাজত্ব করবেন। ২০টি কুঠির বেনিয়ান বিশ্বম্ভর সেন মৃত্যুর পর ২ লক্ষ পাউন্ড সম্পত্তি রেখে যান। রামকমল সেনের উদ্যম এবং কোম্পানি পৃষ্ঠপোষকতা সঙ্গে নিয়ে, তাঁদের পার্থিব আর সামাজিক সম্পদের উত্তরাধিকারী কেশবচন্দ্র সেন হলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম দেশিয় খুঁটি কোলাবরেটর।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই ছিল ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষক ইংরেজি শিক্ষিত ধনী অভিজাতদের সংগঠন। সংগঠনের একেশ্বরবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধার্মিক ভিত্তি একেশ্বরবাদের তত্ত্ব মিলে যাওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের উপনিবেশের প্রত্যক্ষ্য সাহায্য পাওয়া তুলনামূলক সহজ হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ অসম, বম্বে (আধুনিককালের মহারাষ্ট্র, গুজরাট), মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে শাখা বিস্তার করে।

ব্রাহ্ম সমাজের উত্তরপ্রজন্মের স্তম্ভ কোম্পানি-বন্ধু আফিম ব্যবসায়ী, নীলকর, মদ্য উৎপাদক, বেশ্যা কুঠির মালিক পরিবারের কর্তা বাগনাপাড়ার মঠের অনুগামী বৈষ্ণব দ্বারাকানাথ ঠাকুরের উত্তরপুরুষ ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা। তত্ত্ববোধিনী সভার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নতুন ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাস প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের পক্ষেও জনমত গড়ে তোলে। হিন্দুধর্মের বিপক্ষে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমন রুখে দিতে অক্ষয়কুমার দত্তের মত ব্রাহ্ম সমাজের আমূল সংস্কারের সমর্থক বেদের অভ্রান্ততায় প্রশ্ন তুললেন। তাঁর সময় পর্যন্ত বেদের অভ্রান্ততা ছিল ব্রাহ্ম বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একেশ্বরবাদী উপনিষদের নির্বাচিত অংশ ভিত্তি করে ১৮৫০এ নতুন ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে যার নাম হল 'ব্রাহ্ম ধর্ম' অথবা 'এক সত্য ঈশ্বরের পূজারীদের ধর্ম'। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয়করণের বছরে ১৮৫৮

রামকমল সেনের পৌত্র তরুণ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলে একেশ্বরবাদী আন্দোলনে জোয়ার আসে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রশ্নে একমত না হয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬) গঠন করেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের নাম হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লুঠ খুন, অত্যাচার চালাতে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে প্রভাবশালী সাম্রাজ্য সঙ্গী প্রয়োজন ছিল; খ্রিষ্ট মিশনারিরাও উপনিবেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রাধান্য প্রচারে চরম উৎসাহী হয়ে ওঠে। প্রথম দিকের ব্রাহ্ম সমাজ, পরের সময়ের ব্রাহ্ম ধর্ম ইওরোপিয় সংস্কারবাদ আর মিশনারিদের অবস্থান থেকে খুব দূরে যে ছিল না, সেটা আমরা দেখেছি ম্যাক্সমুলারের ব্রাহ্মদের চার্চ অব ইংলন্ডের সদস্যপদ নেওয়ার আহ্বান থেকে। তিন স্বার্থ গোষ্ঠী - শাসক, লুঠের সাহায্যকারী দক্ষিণ এশিয় কোলাবরেটর ভদ্রবিত্ত আর ইওরোপিয় ধর্ম প্রচারকরা কীভাবে আর্য অভিবাসন তত্ত্বের বাহক হয়ে উঠল সেটা এবারের আলোচনার বিষয়।

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজ

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মিশনারিদের নজর ছিল একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম সমাজের কাজকর্মে। ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতদের মধ্যে আদি ব্রাহ্মদের ১৮৫৬য় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে নির্বাসনের উদ্যোগী হলেন দেবেন্দ্রনাথ। আদি সমাজের বহু খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত যুবাদেরও সমাজে আসা নিষিদ্ধ হয়। ব্রাহ্ম

সমাজে বিভেদ বাড়ছে। ১৮৬৭তে আদি ধর্মমতে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী ঝোঁক প্রবল হলে আদি সমাজ থেকে নির্বাসিত খ্রিষ্টিয়রা বাংলার বাইরে থেকে আদি সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে থাকেন। দলের মাথারা মিশনারিদের আগ্রাসী মনোভাবে বিরুদ্ধ দেওয়াল তুলতে যুবা পড়ুয়াদের বেদ শিক্ষা করতে বেনারসে পাঠান। তবে ব্রাহ্ম সমাজের অনেক কিছুই ঠিকঠাক চলছিল না সেটা লাল বিহারী দে'র বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, 'আমি ব্রাহ্ম ছিলাম, যদিও নামে এখনো আছি, কিন্তু বাস্তবে নেই, কিন্তু শান্তি পাইনি। নিশ্চিত তিনি আমার (আদি) পাপ ক্ষমা করবেন' I myself was a Brahmo though not in name yet in reality but I enjoyed no peace of mind. I could be sure He would pardon my sins। লাল বিহারীর বক্তব্য মিশনারিরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

১৮৬৪র এপ্রিলে চুম্বকীয় আকর্ষণ নিয়ে উপনিবেশিক রাজনীটিতে আবির্ভূত হলেন কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করলেন 'দ্য ব্রাহ্ম সমাজ ভিন্ডিকেটেড' প্রবন্ধে। বোঝা যাচ্ছিল কেশবচন্দ্র ইউনিটেরিয় মিশনারি চার্লস ডলের তত্ত্বে প্রভাবিত। তার এই পরিবর্তনের দিকে নজরদারি করছিল সরকার আর মিশনারিরাও। প্রফেসর ওমান লিখছেন, 'পেরেন্ট সোসাইটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে, কেশবের লেখা আর বক্তৃতা ভাইসরয় স্যার জন লরেন্সের সহানুভূতি পেল। স্যর লরেন্স (তাঁর মত) সংস্কারকের কাজ গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতেন, বিশেষ করে যখন কেশব প্রকাশ্যে খ্রিস্টের কথা বলতেন; ভাইসরয় মনে করতেন কেশব প্রকাশ্যে না হলেও (জীবনের) সব ক্ষেত্রেই খ্রিস্টান মতাদর্শে বিশ্বাসী।' অনেকেরই দৃঢ় ধারণা ছিল কেশবের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ সময়ের ব্যাপার।

১৮৭০এ কেশবের লন্ডন যাত্রা উপনিবেশিক কলকাতা আর মেট্রোপলিটনের কোলাবরেটর সমাজকে নাড়িয়ে দিল। কেশবের লন্ডন সফরের ফায়দা তুলতে কোমর বাঁধল সাম্রাজ্য। ওয়াল্টার হাউটনের আশা ছিল, 'পশ্চিমের সমাজের বস্তুবাদী ঝোঁক কেশবের তত্ত্ব আর জনপ্রিয়তা দিয়েই প্রশমন করা সম্ভব।' অনেকেরই বিশ্বাস কেশব উপনিবেশে মিশনারিদের কাজে সহায়ক হবেন, '(তাঁর মত) হিন্দু প্রতিভা বাইবেলের শিক্ষা নতুন ব্যাখ্যায় উপস্থিত করবেন। তাঁর শিক্ষা ইংল্যান্ডের জন্য উপাদেয় হয়ে নতুন শক্তি অর্জন করবে, বিশেষ করে কারখানা শিল্পকর্ম এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রমরমার যুগে যখন আর খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে।' লন্ডনের বহু মিশনারি সংস্থার আশা ছিল কেশব দেশবাসীকে খ্রিস্টধর্মের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূল্যবান সহযোগী হবেন। জেসুঈটেরা যেমন আকবর জাহাঙ্গীরকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তেমনি কেশবচন্দ্রকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে উদগ্রীব হল। মাথায় রাখতে হবে ধর্মান্তরকরণ সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্রও গোপন এজেন্ডা ছিল না।

কেশবের খ্রিষ্টধর্মে মতিতে ম্যাক্সমুলার প্রকাশ্যে বলেছিলেন একমাত্র বিশপ কটন কেশবচন্দ্রকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি। কেশবচন্দ্রকে যে সাম্রাজ্য, উপনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রজা, সাম্রাজ্যের ছোট তরফ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় ভিক্টোরিয়া তাকে দুটি বই উপহার দেওয়ায়, ৪০টা ব্রিটিশ শহর আর আমেরিকায় বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে ডাক পাওয়ায়।

কেশবচন্দ্রের ছায়াসঙ্গী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলছেন লন্ডন তার নেতাকে নিয়ে নায়ক উপাসনায় মেতেছে। ১৮৭০এর ৪ জুন সানডে রিভিউ কেশবচন্দ্রের খ্রিষ্টধর্মানুরাগ বিষয়ে লিখল, 'পশ্চিমি সভ্যতা, বিশেষ করে ইংরেজদের তৈরি সভ্যতা বাংলায় কী ধরণের প্রভাব তৈরি করতে পারে তার নিদর্শন কেশবন্দ্র সেনের মত দেশীয় ভদ্রলোকেরা, এরা সাম্রাজ্যের হাতে তৈরি। তিনি ব্রিটিশ ধর্ম এবং ইংরেজি বই পাঠে নিজেকে নিষিক্ত করেছেন, অন্তত আমাদের প্রজন্ম কোন ভাবনায় ভাবুক হয়েছে, সে বিষয়টা অন্তঃস্থ করতে পেরেছেন, তিনি ধার্মিক মত প্রকাশে যথেষ্ট আন্তরিক, তার আন্তরিকতা প্রাচ্যতার চেয়েও বেশি ইংরেজ ধরণের।' পাঞ্জাবে সিপাহি বিদ্রোহ দমনের নায়ক স্যর লরেন্স লন্ডনে কেশবচন্দ্রের সঙ্গী হলেন। তিনি মনে করতেন কেশব সাম্রাজ্যের পক্ষে দ্বৈত ভূমিকা পালন করছেন, এক দিকে তিনি সাম্রাজ্যকে তার দায়িত্ব কর্তব্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অন্যদিকে উপনিবেশের প্রজারা কীভাবে সাম্রাজ্যের সঙ্গী হয়ে উপকৃত হতে পারে সে সবই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

কেশবকে বাদ দিলে ম্যাক্সমুলার বাংলার অন্য নেতাদের নিয়ে খুব খুশি ছিলেন না বলেই তাদের নিয়ে খোলামেলা মত প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে নি। রামমোহন আর দেবেন্দ্রনাথ বিষয়ে তার বীতরাগ যথেষ্ট ছিল। রামমোহন সম্বন্ধে বললেন men of the type of Rammohun Roy। মনে করতেন নৈতিকতার দৃষ্টিতে খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে এই সব মানুষের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়, এমন কী রামমোহনেরও নয় These men Could not, and did not, shut their eyes to the superiority of Christianity from an ethical point of view. They despised in their heart the idols, as worshipped by the vulgar and had long learnt to doubt the efficacy of their sacrifices। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার চিঠিপত্রে যোগাযোগ থাকলেও, এ বিষয়ে তিনি যে খুব উৎসাহী ছিলেন, মনে হয় না So far I can judge, Debendranath and his friends were averse to unnecessary innovations, and afraid of anything likely to wound the national feelings of the great mass of the people।

অথচ কেশবের প্রশংসায় মুলার মুক্তকচ্ছ। তার ধারণা কেশবের হাত দিয়েই ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তার ঘটবে। ১৮৬৬তে কেশবের Jesus Christ: Europe and Asia বক্তৃতার পরে মুলার মন্তব্য করলেন, 'ভারতীয় আর ইওরোপিয় প্রজা, উভয়েরই ধারণা কেশব প্রকাশ্যেই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবেন।' ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে মুলারের ধারণা ছিল, 'এই ধর্ম সংগঠন, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রচারক নিয়োগ করেছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।' ১৮৭০এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি মুলারকে দিলেন কলকাতার বিশপ ড মিলান। মুলারের ধারণা ছিল সত্যেন্দ্রনাথ দেশে বেদ প্রচারের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারে সহায়ক হবেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের তোলা খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে মুলার দিতে পারেন নি।

কেশবচন্দ্র এবং আর্য অভিবাসন তত্ত্ব

কেশবচন্দ্র Jesus Christ: Europe and Asia বক্তৃতায় বললেন যিশু যেহেতু এশিয়াজাত, তাই এশিয়রাই বাইবেলের মর্মার্থ বোঝে And is it not true that an Asiatic can read the imageries and allegories of the Gospel, and its descriptions of natural sceneries, of customs and manners, with greater interest, and a fuller perception of their force and beauty, than Europeans? কেশবের ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে দ্বিধা ছিল না, তিনি সাম্রাজ্যের সামাজিক যোগসূত্র তৈরি এবং নৈতিক আশীর্বাদে আস্থা রাখতেন। এশিয় খ্রিষ্টদের সমালোচনা করে কেশব লন্ডনে বসে বললেন 'ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথেই স্বইচ্ছাতেই তারা নিজেদের দেশিয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এর অনিবার্য পরিণতি, প্রাচ্যের সমস্ত কিছুর প্রতি একধরনের ঘৃণা জন্মানো এবং ইউরোপীয় সমস্ত কিছুর জন্য অতিরিক্ত উৎসাহী প্রশংসা প্রকাশ (সাধু, সাধু)। তারা দেশ এবং জাতীয়তায় লজ্জিত থাকে। তারা ভুলে যায় তাদের প্রভু খ্রীষ্ট, এশিয়াটিক। দেশ বা জাতি থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত করার জন্য মহান খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।' দলে দলে সদস্যদের খ্রিষ্টপন্থী হয়ে যাওয়া থেকে সংগঠন বাঁচাতে তাকে এইভাবে সক্রিয় হতে হয়েছে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ব্রাহ্ম সমাজের খবর ছাপত। ব্রিটেনে ব্রাহ্ম আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্য সূত্র ছিল শ্রীরামপুর। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া থেকে ব্রাহ্মদের সংবাদ ছাপত পল মল গেজেট আর বার্মিংহাত ডেলি পোস্ট। ১৮৭০ অবদি তারা কেশবচন্দ্রের কাজকর্মের সমর্থক ছিল। তারা কেশবচন্দ্রের Primitive Faith and Modern Speculations ধারণাটি সমর্থন করে। তাদের বক্তব্য a great key principle of religion which cannot fail to spread, and spread for good।

মুলার, কেশবচন্দ্র এবং আর্যতত্ত্ব

এর আগে আমরা দেখেছি মুলার, রামমোহন আর দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিতশ্রদ্ধ কিন্তু কেশবকে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তারে সহায়ক হওয়ার ডাক দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এবং বালগঙ্গাধর তিলক মুলারের নাম দিয়েছিলেন ভট্ট মোক্ষমুলার। রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে মুলারের চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। মুলার চিঠিতে বার বার প্রশ্ন ছুঁড়েছেন কেন ভারতে খ্রিষ্টিয় বৈদান্তিকের অভাব ঘটছে? উইফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ চমৎকার উত্তর দিচ্ছেন, হিন্দু বেদকে লিখিত গ্রন্থে রূপান্তরিত করা উনবিংশ শতাব্দের পশ্চিমা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী আধিপত্যের উদাহরণ, বেদ যে 'শাস্ত্র' বা স্ক্রিপচার, এটা পশ্চিমি ধারণা। মুলার চাইতেন হিন্দুধর্ম আর খ্রিষ্টধর্ম আরও কাছাকাছি আসুক, 'হিন্দুধর্ম আর ইসলামের মধ্যে চারশো বছর আগে যে বোঝাপড়া হয়, উচ্চমার্গের বাকপটুতায় হিন্দুধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে ঠিক সেই ধরণের সমঝোতার কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন রামমোহন রায় আর কেশব চন্দ্র সেনের অনুসারীরা।' খ্রিষ্টিয় চার্চে কেশবচন্দ্রের আনুগত্য বিষয়ে তিনি লিখলেন Woe unto us, if I ever conceived the project of setting up a movement against the Church of Christ! Perish these lips if they utter a word of rebellion against Jesus।

সাম্রাজ্য পরিচালকরাই নয় কেশবও খ্রিষ্টধর্মে আনুগত্য প্রকাশে কম উৎসাহ দেখান নি। নিউ ডিসপেনসন, নববিধান তত্ত্বের সঙ্গে এংলিকান চার্চের প্রার্থনার অদ্ভুত মিল। নিউ ডিসপেনসনে আর্য শব্দ স্পষ্ট উল্লেখ হল the Sacred Laws of the Aryans of the New Dispensation। আর্য যে ভাষা নয় জাতি, সেটা এই ব্রাহ্ম বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তিনি আরও বললেন, It is only the national law of the Aryans of the New Church in India। কেশবের আর্যতত্ত্বে ভারত, ব্রিটেন আর বেদ মিশে একাকার। পবিত্র আইনের সঙ্গে মেলালেন ঋগ্বেদ, তার সঙ্গে মিলল জর্ডন নদীর তীরে ভগবানের পুত্রের ব্যাপ্টিজমের আইনও। কেশবচন্দ্রের ভাবনায় গভীরভাবে আর্যতত্ত্বর রেশ খুঁজে পাই।

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের আর্যতত্ত্ব পৃষ্ঠপোষণা

বিশ্বজোড়া রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের ন্যায্যতা প্রমানে উপনিবেশ রক্ষা আর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে শক্তিশালী তত্ত্ব প্রচার প্রসারের গুরুত্ব ব্রিটিশ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের অজানা ছিল না। ভিক্টোরিয় সাম্রাজ্য প্রাচীন বিশ্বাস ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, প্যাক্স ব্রিটানিকারও পৃষ্ঠপোষণা করেছে। আঞ্চলিক যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক কারখানা নির্ভর রাষ্ট্রীয় যুদ্ধপুঁজিবাদ নির্ভর সাম্রাজ্য বিস্তার

ঘটিয়েছে। মেট্রোপলিটনে উৎপাদিত পণ্য উপনিবেশে রপ্তানির পিঠেপিঠি সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব-তথ্য নানা মোড়কে পৌঁছেছে উপনিবেশিক ব্যক্তিনির্ভর সাহিত্য আর সংস্কার আন্দোলন মার্ফৎ। সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানচর্চা জাত, ভাষা, কৃষ্টি ইত্যাদি তত্ত্ব-তালাশ খুব দ্রুত আত্মস্থ করতে দক্ষ ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রের মানুষজন। আমরা দেখব সাম্রাজ্যস্বার্থে জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম নাটবল্টু ছিলেন ম্যাক্সমুলার।

ড্যালিয়েল লেরয়, 'রেশিওলজিক্যাল থট ইন ভিক্টোরিয়ান কালচার - আ স্টাডি ইন ইম্পিরিয়াল ডেসিমিনেশন' গবেষণায় বলছেন কীভাবে মুলারের মত ভাষাতাত্ত্বিকদের লেখাপত্র থেকে ভিক্টোরিয় ক্ষমতাবানেরা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে অকাতরে ব্যবহার হওয়া 'ব্রিটন', 'এংলোস্যাক্সন' জাতীয় বুলি আত্মস্থ করে লেখায়, বক্তব্যে, আলাপ-আলোচনায় অবলীলায় প্রকাশ করেছে The new imperial culture in speeches, addresses, and myriad public utterances, described itself with a vocabulary learned from the philologists, and the 'Britons' and 'Anglo-Saxon' which emerged from the antiquarian studies of Max Müller। ভিক্টোরিয় যুগে রাজতন্ত্রকে প্রভাবিত করা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক ম্যাক্সমুলার। তিনি যে তত্ত্ব উৎপাদন করতেন, সেই তত্ত্ব নির্ভর করে সাম্রাজ্য সুগঠিত হত। ১৮৪৬এ লন্ডনে অভিবাসিত হয়ে আসা মুলার এক দশকে এতই বিখ্যাত আর প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন যে, ১৮৫৬র ২৫ আগস্ট, সিপাহি যুদ্ধের এক বছর আগে জার্মান অভিজাত ব্যারন ভন বুনসেন [বিখ্যাত না হওয়ার আগে মুলারের সমর্থক] ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ভিক্টোরিয়ার স্বামী যুবরাজ এলবার্টের নাম উচ্চারণ করবেন, 'ভারতবর্ষ দখল হওয়ার পরে জাতির স্বার্থ কেন্দ্র করে, ধর্ম এবং চেতনা [বিস্তার] সংগ্রাম শুরু হল। সেন্ট পলের সময়ের গ্রিস বা রোমে তুলনায় আজ ভারতবর্ষের ভূমি আর জনগণ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে অনেক বেশি তৈরি। রাজ দরবারে দিলীপ সিংহ স্পষ্টতই উপযুক্ত রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে রাজকুমার এলবার্ট বা আপনি(ম্যাক্সমুলার) কী আমায় সাহায্য করতে পারেন?' মাথায় রাখা দরকার ব্রিটিশ রাজদরবারে এবং ভিক্টোরিয়ার স্বামী যুবরাজ এলবার্টের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন প্রুশিয় রাজদূত ভন বুনসেন। বুনসেনেরই ভাবশিষ্য মুলার। তার মাধ্যমেই মুলারের রাজসকাশে গমনের ইচ্ছাপূরণ।

১৮৬৪র মুলারের চিঠি রাজদরবারে তাঁর দ্রুত উত্থানের ইঙ্গিত, 'দয়ালু রাণী জানিয়েছেন তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে উন্মুখ।' রাণী, আর তাঁর স্বামী মুলারের ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে আসতেন; মুলার লিখছেন, 'বক্তৃতা তিনি মন দিয়ে শুনতেন, উল বোনার সরঞ্জাম পড়ে থাকত।' ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উৎসাহে

ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্টের অসবোর্ন প্রাসাদে মুলার বক্তৃতা করতে যেতেন; এক সকালে রাজকুমার আর্থার এবং রাণীর শল্য চিকিৎসক স্যর জেমস ক্লার্কের সামনে যে বক্তৃতা করেন, তার শেষ স্তবক 'বেদের দুখণ্ড অনুবাদ করে তার বিলয় রুখলাম। বেদ ঈলিয়াডের থেকেও প্রাচীন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহান সব সভ্যতার যত সাহিত্য আমাদের জানা, সব কটির থেকেও প্রাচীন, তারা এটা পেয়েছে প্রাচীন এক সেমিটিক জাতি ইহুদিদের থেকে - কিন্তু এর প্রধান সম্পদ হল রেলিজিয়ান, ওল্ড আর নিউ টেস্টামেন্টের রেলিজিয়ান আপাতত ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে এবং সেই সম্পদ ধারণ করে সে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য, উপনিবেশ, শিক্ষা এবং ধর্মান্তরণ করে চলেছে।'

নিজের বক্তব্যে কাজের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করে মুলার রাজতন্ত্রের প্রধানতম কারিগরদের সামনে সাম্রাজ্যস্বার্থে ব্যবহারযোগ্য আর্যতত্ত্বের দরকারি শাঁশটুকু তুলে ধরলেন। অসামান্য কুশলী বক্তৃতার শেষ পর্বে উঠে এল ব্রিটিশ জাতিবাদী শ্রেষ্ঠত্ব, উপনিবেশিক শাসনের বৈধতা এবং ইলিয়াডের থেকেও পুরোনো এক লিখন কাণ্ডকারখানার সঙ্গে ব্রিটিশ জাতিকে জুড়ে রাখার বার্তা যা আদতে ইওরোপিয় প্রাচ্যবাদী রোমান্টিসিজমের মূল কথা। মাথায় রাখতে হবে মুলার একাই রাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতম ছিলন না, ভিক্টোরিয়ার চ্যাপলেইন ধ্রুপদী হিব্রু পণ্ডিত যোসেফ বারবার লাইটফুটও রাজতন্ত্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৫এর মধ্যে তিনি জাতিবাদ নির্ভর ভাষাবিদ্যাগত, বুৎপত্তিগত প্রমান সহযোগে নিউ টেস্টামেন্টের নতুন ভাষ্য লিখেবেন।

তো এই সময়ের আশেপাশে ১৮৭০এ কেশবচন্দ্র সাম্রাজ্য কেন্দ্র, ইংলন্ডে পৌঁছে দেখছেন তার সামনে আর্যতত্ত্ব প্রচারের মঞ্চ তৈরি হয়েই আছে। মুলারের মত পণ্ডিতদের থেকে রাজপরিবার যে জ্ঞান আহরণ করেছিল, উপনিবেশ থেকে মেট্রোপলিটনে পৌঁছনো কেশবচন্দ্র সেই জ্ঞানচর্চা ধারার শিক্ষকসম মানুষটির কথাগুলোই নতুন করে উপস্থাপন করবেন।

ব্রাহ্ম সমাজের রাজনীতি - সাম্রাজ্যের হাতিয়ার হওয়া

প্রাচীন শাস্ত্র আবিষ্কারের দাবি এবং আর্যতত্ত্ব ছিল উপনিবেশ চালানোতে শাসকবর্গের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ম্যাক্সমুলার আর কেশবচন্দ্রের ভাব-ভাবনা আদানপ্রদানে, একই সঙ্গে মিশনারিদের অত্যধিক উৎসাহে আর্যতত্ত্ব প্রায় সবস্তরে মান্যতা পেল। কার্জনের ভাষায় 'সাম্রাজ্যের (বিস্তার, রক্ষার) প্রয়োজনীয় হাতিয়ার' হয়ে উঠল আর্যতত্ত্ব।

কেশবচন্দ্রের জন্মের বহু আগে ১৮০৪এ আলেকজান্ডার টড লিখেছিলেন, 'সংস্কৃততে লেখা সেরা রচনাগুলো, ভারতীয় ভাষাগুলোয় অনুবাদ, বিজ্ঞান আর সভ্যতার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে।' সভ্যতার প্রসার অর্থে কর্পোরেট সাম্রাজ্যের

কাঠামো বিস্তার বুঝতে হবে। শাসিতের ইতিহাস, কৃষ্টির বাখান সাম্রাজ্যের স্বার্থের মোড়কে উপনিবেশের প্রজাদের উপযোগী করে উপস্থিত করা প্রয়োজন হয়ে উঠছিল গ্রামগঞ্জের বিপ্লবমুখী জনগণের বিদ্রোহ প্রতিষেধক টোটকা হিসেবে। সে সব বিপ্লব স্থানীয়স্তরে নানাভাবে মোকাবেলা করলেও ১৮৫৭র সম্মিলিত মরণপণ লড়াই শাসকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শুধু হাতে গোনা জমিদার বা রাজা পাশে নিয়ে শাসনের দিন শেষ, সাম্রাজ্য চালাতে আরও বেশি ইংরেজি শিক্ষিত অনুগত ভদ্রবিত্ত প্রয়োজন। সিপাহি যুদ্ধের আগেই চার্লস ট্রেভলিয়ন ভারতবর্ষ এবং ইওরোপের ঘটেচলা বৈপ্লবিক ঘটনা সামাল দিতে ম্যাক্সমুলারের থেকে প্রাচ্য ভাষা বিষয়ে নতুন গবেষণার প্রস্তাব আহ্বান করবেন; মুলার নিরাশ করেন নি। মুলারের প্রস্তাবনা থেকে যেমন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসকেরা সরাসরি পাঠ নিচ্ছেন, তেমনি খ্রিষ্ট মিশনারিরাও মুলার-প্রস্তাব রূপায়নে কোমর বাঁধবেন।

এই প্রচেষ্টার প্রথম উদ্যম হল ভারতবর্ষকে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা থেকে বার করে এনে মুঘল দরবারের অনুকরণে ঢেলে সাজা। ১৮৭৬এ ভিক্টোরিয়া ভারতের সাম্রাজ্ঞী হিসেবে সিংহাসনে আরোহনের উদ্যম নেওয়া হবে পরের বছর বহুচর্চিত দিল্লি দরবার আয়োজন করে। মেরিডিথ বর্থউইক দেখাচ্ছেন রাণীর সার্বভৌমত্ব এবং সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যস্বার্থ রক্ষার প্রতি কেশবচন্দ্রের প্রশ্নহীন আনুগত্য সে সময়ের সার্বিকভাবে শিক্ষিত প্রজাদের সাম্রাজ্য অনুগামী মানসিকতারই প্রতিনিধি। স্বাভাবিকভাবে কেশবচন্দ্র উপনিবেশের শাসক ব্রিটিশ সমাজ, বিশেষত শাসকবর্গের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছিলেন, 'তার সাম্রাজ্য আনুগত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত প্রজাবর্গের ওপরেও কেশবচন্দ্রের প্রভাব বাড়ল; এরপর তিনি অকৃতজ্ঞ না হওয়ার টিকা কপালে পরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃদু সমালোচনা করবেন।' ব্রিটিশ শাসন নিয়ে তাঁর বেসুরো কথাবার্তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হত। সাম্রাজ্য বিষয়ে তাঁর মনোভাব ঈষদ পরিবর্তন হলেও আর্যতত্ত্বে আস্থা টলে নি, কেশবচন্দ্র বারবার আর্যতত্ত্বকে মান্যতা দিয়েছেন।

১৮৭৭। সিপাহি যুদ্ধ দু'দশক পুরোনো। কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে দাঁড়িয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আনুগত্য দেখানোয় কার্পণ্য করলেন না। শিক্ষিত দেশিয় প্রাজাদের রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'ব্রিটিশেরা সর্বশক্তিমানের দূত হিসেবে (ভারতবর্ষ) উদ্ধারে এসেছে, বিশেষ করে যখন এই দেশ অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং আশাহীন জেজুনত্বে (ফলপ্রসূ বা সন্তোষজনক ভাবনার অভাব) নিমজ্জিত ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (এই দেশকে) সেই অবস্থা থেকে আজকের সম্মানজনক অবস্থানে তুলে নিয়েছে...।' কেশবচন্দ্রের বক্তব্যে মুলারের তত্ত্বের প্রভাব দৃশ্যমান।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের উদ্দেশ্যে কেশবের সাম্রাজ্যের পায়ে আত্মনিবেদনের আহ্বান উপনিবেশিক শিক্ষিত ভদ্রবিত্তের কাছে ছিল চরম আদরের। ব্রিটিশ শাসনের আগে শাসকেরা দেশের বিকেন্দ্রিভূত কারিগর হকার চাষী নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা বদলান নি। তারা শোষক ছিলেন, কিন্তু লুঠেরা ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত উপনিবেশের লুঠজাত সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। ব্রিটিশপূর্ব সময়ে ভদ্রবিত্তরা ক্ষমতার সঙ্গী হলেও ছোটলোকদের নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতাধর ছিল না, হাতে ছোটলোকেদের মাথা কাটার যোগ্যতা, ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু কর্পোরেট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম তাত্ত্বিক উইলিয়াম জোনস ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রবিত্তকে ক্ষমতায় মুক্তহস্ত পুনর্বাসন দিলে তারা অতিআগ্রহে দেশিয় উৎপাদন কাঠামো ধ্বংসে ব্রিটিশ যুদ্ধের সঙ্গী হল, প্রতিদানও পেল।

তিনি বললেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভদ্রবিত্তকে অনেক কিছু দিয়েছে, ব্রিটিশ শাসনে ভদ্রবিত্তের মুক্তি ঘটেছে। ব্রিটিশরা এ দেশে আসার আগে ঘোর অমানিশা ছিল, সেই অন্ধকার থেকে তারা দেশকে মুক্তি দিয়েছে। প্রতিদানে ভদ্রবিত্ত আরও অনুগত, আরও অবনত হোক। কেশবচন্দ্র ভদ্রবিত্তদের থেকে যেমন প্রশ্নহীন আনুগত্য চাইলেন, তেমনি ব্রিটিশদেরও বললেন তোমরাও আমাদের থেকে প্রাচীন জ্ঞান আহরণ কর এবং বললেন এই শিক্ষা গ্রহণে হীনমন্যতা কোরোনা কারন আমরা অতীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া একই পরিবারের আলাদা ধারার বংশধর, 'ভারত বর্তমান পতিত অবস্থায় পশ্চিমি শিল্প বিজ্ঞান শেখার জন্যে আগামী দিনে ইংল্যান্ডের পায়ের তলায় অবনত থাকবে। আমরা যেভাবে ইংল্যান্ডের থেকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখেছি, তেমনি ইংল্যান্ড ভারতবর্ষের থেকে প্রাচীন জ্ঞান শিখুক। হে ভদ্রবিত্ত সমাজ, ভারতে ইংরেজ জাতির আবির্ভাবে আমরা যেন সেই প্রাচীনকালে ছেড়ে আসা আর্য জাতির দুটি ভিন্ন পরিবারের বংশধরদের ভাইদের পুনঃমিলনের ঘটনা দেখছি।' 'আলাদা হওয়া ভাই', parted cousins শব্দবন্ধ সাম্রাজ্য লুঠে, সাম্রাজ্য রক্ষায়, বিদ্রোহ/স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনে নিয়োজিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের প্রতি সাম্রাজ্য আনুগত্য আহ্বানের প্রকাশভঙ্গী।

মাথায় রাখা দরকার কেশবচন্দ্র তার মত করে আর্যতত্ত্বকে দুমড়েমুচড়ে উপস্থিত করলেও মুলার রুষ্ট হন নি, বরং তিনি পরের দিকের বক্তৃতায় কেশবের অবস্থানকে মান্যতা দিয়েছেন। আগেই বলেছি রাজপরিবারের এবং শাসকদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুলার চাহিদা মত চাকরি পান না, তাকে অক্সফোর্ডের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনার পিটুলিগোলাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ক্ষুব্ধ মুলার আর্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থান সংশোধন করে আর্যতত্ত্বের জাতিবাদিতার নখ, দাঁত উপড়ে আর্যত্বে

জাতির দাবি বিষয়ে গলার স্বর নামিয়ে আর্যকে ভাষা হিসেবে রায় দেবেন। কিন্তু তিনি যে নিজের অবস্থানে পুরোপুরি অনড় থাকছেন না, প্রমান ১৮৮৩তে রামমোহন রায়ের স্মৃতি বক্তৃতা। মুলার বলবেন, 'রামমোহন রায় আর্য জাতির দক্ষিণ-পূর্ব শাখার আর্য, তিনি আর্য ভাষার এক ভাষা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন - রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ড সফরে আমরা আর্য জাতি দুটি বড় শাখার মিলিত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছি, তারা (ভারতবর্ষীয়রা) এতদিন বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যেই যৌথ উৎস, যৌথ ভাষা, যৌথ বিশ্বাসের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল।' কেশবচন্দ্র এবং মুলার এই বিষয়ে একমত হয়ে 'ভাষাগত' শাখার উৎসকে 'সাধারণ বিশ্বাস'এ রূপান্তরিত করবেন।

১৮৮০তে গ্ল্যাডস্টোন ক্ষমতায় ফেরায় রিপন ভাইসরয় মনোনীত হলেন। সেটা উপনিবেশিক ভারতবর্ষে শহুরে অভিজাত ভদ্রবিত্তের অধিকার, দায়িত্ব নিয়ে রিপনীয় উদারবাদী পরিকল্পনার যুগ। তবুও উপনিবেশে রিপনের উদারবাদ চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারন সিপাহি যুদ্ধের পরের যুগে সাম্রাজ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের রেশ ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উদারবাদকে পথহারা করে।

১০০ বছরের সাম্রাজ্য বিরোধী অবিশ্রান্ত গ্রামীণ লড়াই এবং ১৮৫৭য় সেই বিক্ষোভ বিপুলভাবে ফেটে পড়া থেকে সাম্রাজ্যের উদারবাদীরা বুঝতে পারছিল শুধু হাতে গোনা রাজারাজড়াদের প্রভাবে সাম্রাজ্যধ্বজা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ১৮৫৭র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী লড়াইতে অগুনতি রাজারাজড়া অংশ নিয়েছেন; কর্তারা বুঝলেন শুধু রাজারাজড়াদের ওপর আস্থা পেশ করে সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্যম নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। একই সঙ্গে চাকরি, দালালি করা অথবা সাম্রাজ্যকে মান্যতা দিয়ে নানান উঞ্ছবৃত্তিতে নিযুক্ত ভদ্রবিত্তের মধ্যে প্রশ্নহীন সাম্রাজ্য আনুগত্যের অভাব না থাকলেও তাদের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বাড়বাড়ন্তে উদারবাদীরা শঙ্কিত হচ্ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক জে আর স্টিলি ১৮৮১তে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে আশঙ্কিত হয়ে লিখলেন, 'যেদিন [ভারতে] সাধারণ যৌথ জাতীয়তার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাবে, সেদিনই আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পিতৃতন্ত্র, কঠোর সাম্রাজ্য থাকবন্দী কাঠামো; সাম্রাজ্যের ভিত্তিটাই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, অনাগত ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যজুড়ে আরও বেশি হিংসাশ্রয়ী, আরও গভীর জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটবে এবং এর ফলে সাম্রাজ্য বিলয়ের আশংকাও উড়িয়ে দিচ্ছিলেন না প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

সনিয়া রোজ, ক্যাথেরিন হল সম্পাদিত 'এট হোম উইথ দ্য এম্পায়ার - মেট্রোপলিটন কালচার এন্ড দ্য ইম্পিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' বইতে 'সিটিজেনশিপ এন্ড এম্পায়ার' প্রবন্ধে

রোজ এবং ম্যাক্লিল্যান্ড বলছেন, উপনিবেশে বিপ্লব প্রচেষ্টা রোখার উদ্যম হিসেবে ১৮৮০তে ব্রিটেনে সিটিজেনশিপ, নাগরিকত্বের মত শব্দ ব্যবহার হচ্ছে সামরিক এবং পিতৃতান্ত্রিক ভাষায় প্রজার জাতীয় এবং সাম্রাজ্য দায়িত্ব বোঝাবার কাজে। ১৮৮০ থেকে লন্ডনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সাম্রাজ্যের ভাষায় প্রজাদের সাম্রাজ্য উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিকস্তরের পাঠশালায় সার্বজনীক পড়াশোনা এবং পাঠকক্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পরিকল্পনা হল। ১৮৮০র দশকে গ্ল্যাডস্টোনের উদ্যোগে জনপ্রিয় সাম্রাজ্যতত্ত্বের উদারপন্থী ধারা বাজারে এলেও ১৮৯০এর আগে জনগণের মানসিকতায় সে তত্ত্ব মান্যতা পায় নি। ডিজরেলির আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য পরিচালকদের পছন্দের ছিল; সাম্রাজ্যের কর্তারা মনে করতেন উপনিবেশের প্রজাদের জন্যে তৈরি রাজনৈতিক, জনপ্রিয় এবং শিক্ষা মঞ্চগুলোয় উপস্থিত থেকে শাসকদের প্রজাদের উদ্দেশ্যে আরও পুরুষতান্ত্রিক, আরও রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ করা দরকার। এই নব সময়ের রক্ষণশীলতার বলি হবেন মুলার। এই ধারণার জলজ্যান্ত প্রভাব দেখেছি মুলার-মনিয়ের চাকরি দ্বন্দ্বে। ১৮৮০র দশকে অক্সফোর্ড শিক্ষাঙ্গনে মুলারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনিয়ের উইলিয়ামস প্রাচ্য বিষয়ে উদারপন্থী অবস্থান থেকে সরে গিয়ে মুলারের 'সেক্রেড বুকস'কে আখ্যা দিচ্ছেন limp-wristed comparative scholarship হিসেবে এবং ১৮৮৭তে তার কর্মকাণ্ডকে হ্যাটা করে বলবেন 'শিরদাঁড়াহীন অপৌরুষেয় সহনশীলতা' 'আনম্যানলি জেলিফিস টলারেন্স'।

সাম্রাজ্য কেন্দ্র, মেট্রোপলিটন লন্ডনে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে কেশবচন্দ্র সাম্রাজ্যের কর্তাদের আশ্বাস দিলেন বিশ্বব্রাহ্মধর্ম ভারতবর্ষ ব্রিটেনের নতুন নৈতিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাঁর এই বক্তব্য দেশিয় ব্রাহ্ম সমাজে অগ্রাহ্য হল। কেশব বিরোধীদের অভিযোগ, তিনি রাণীর প্রতি অসীম আনুগত্য প্রকাশ করে রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক অধিকার মান্যতা দিচ্ছেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের কাজকর্মে নিরঙ্কুশ শাসন যুগের সূচনা করছেন, ১৮৭৬এ, আনন্দ মোহন বসুর নেতৃত্বে, সমাজের প্রগতিশীল গোষ্ঠী আর কেশবচন্দ্রের গোষ্ঠীর মধ্যে সাংবিধানিক বিরোধ মাথাচাড়া দেয়। হেয়ার স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী নব্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। অভিযোগ কেশবচন্দ্র রাজার ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্বের অধিকারকে মান্যতা দিয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার সমর্থন ব্রাহ্মসমাজে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান।

ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ানেরা ব্রাহ্ম সমাজের বহুকালের সমর্থক ছিলেন। ১৮৭৭এ দ্য এনকুইরার বলল ব্রাহ্ম সমাজ ভারতবর্ষে [খ্রিষ্ট] ধর্ম প্রচারের সেরাতম আশা। সাম্রাজ্যের সক্রিয় সমর্থন সত্ত্বেও বঙ্গজ সমাজপতিরা কেশবচন্দ্রের দিকে বিদ্বেষের অঙ্গুল তুললে কেশব নতুন করে অবস্থান বদল করলেন। ১৮৮০ থেকে তার প্রয়াণের

বছর ১৮৮৪ পর্যন্ত ক্রমশ কেশবচন্দ্র, রাজতন্ত্র নিয়ে অবস্থান কঠোর করবেন, বিরুদ্ধতা প্রকাশ করবেন সমাজে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবেন। ১৮৮৩এ জানুয়ারিতে কলকাতার অভিজাত বাঙালি এবং ইওরোপিয় ভদ্রমণ্ডলীর উপস্থিতিতে 'এশিয়াজ ম্যাসেজ টু ইওরোপ' বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকারের নামিয়ে আনা নৃশংসতা বিষয়ে ব্যতিক্রমী বক্তব্যে উপস্থিত শ্রেতৃমণ্ডলী অবাক হবেন Whence this plaintive and mournful cry, which so profoundly distresses the patriot's breast? It seems that a whole continent is writhing beneath the lash of oppression, and sending forth from the depths of its heart a deep wail of woe. It is India that weeps. Nay, not India alone; all Asia cries. Many there are in Europe who hold that Asia is a vile woman, full of impurity and uncleanness. Her scriptures tell lies; her prophets are all impostors; her people are all untruthful and deceitful. Europe has perpetrated frightful havoc among the nations of the East. Europe, why do thy eyes still roll in wild fury and insatiate antagonism, as if bent upon Asia's total annihilation? Before the formidable artillery of Europe's aggressive civilization the scriptures and prophets, the language and literature, of the East, nay her customs and manners, her social and domestic institutions, and her very industries have undergone a cruel slaughter. The rivers that flow eastward and the rivers that flow westward are crimson with Asiatic gore।'

কেশবচন্দ্র ১৮৮০র দশকজুড়ে, সাম্রাজ্য প্রশাসনে দেশিয়দের আরও বেশি অংশগ্রহনের ১৮৭০এর দাবি নতুন করে তুললেও, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর দাবি জানাননি; তিনি মনে করতেন এশিয়া রাজনৈতিক পুনর্মিলনের ধর্মনিরপেক্ষ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি আধ্যাত্মিক জোটের তত্ত্ব তুললেন, যে জোট খ্রিষ্টকে সামনে রেখে পতিত মানবতা উদ্ধার কল্পে এশিয়া ইওরোপ পরম সৌহার্দ্যে হাত মেলাবে; তিনি ভিক্টোরিয়ার দৈবী চরিত্রেও আস্থা পেশ করলেন।

ডেভিড আর্নল্ড বলছেন Orientalist Triptych, প্রাচ্যবাদী তিন[ভুল]ছবিতে শুধু যে ইওরোপিয় ইউনিভার্সালিস্টেরাই আস্থা পেশ করেছেন এমন নয়, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, ন্যাশনাল পেপারের লেখকেরাও সেই ধারণা সযত্নে লালন-পালন করেছেন। এই বিষয়ে বিশদে আলোচনার আগে প্রাচ্যবাদের স্বরূপ যতটা সংক্ষিপ্তাকারে পারা যায় আলোচনা করলাম -

১) প্রাচীনকাল ছিল ঋষি, মুণি, আশ্রমের যুগ। রাক্ষসটাক্ষসের উৎপাত বাদ দিলে সুখ সমৃদ্ধি আর দুধ-মধুর সব পেয়েছির যুগ; মানুষ মুক্ত, সৃজনশীল। মূলত ইওরোপিয়, খুব বেশি হলে ককেশাসিয়দের তৈরি যুগ, তারা দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে সভ্যতা নির্মাণ করে। উপনিবেশ কালে যেমন ইওরোপ আজকে যেমন আমেরিকা সভ্যতা রপ্তানি করে, ঠিক তেমনি ছিল প্রাচীনকালের আর্যরা। ইসলামপূর্ব 'শান্ত' 'সমৃদ্ধি'র যুগ।

২) এল ক্রুসেড, ইওরোপের চিরস্থায়ী দুর্দশা, ব্যর্থতা - ইসলাম, মুসলমান, প্রাচ্য, মহিলা, অভদ্রলোক, বৈচিত্র বিদ্বেষ। প্রাচ্যবাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত মধ্যযুগই অন্ধকার সময়। ভারতবর্ষের পতন। অবক্ষয়ে ডুবে যাওয়া; অন্ধকার, অন্ধকার আরও অন্ধকার।

৩) যে ইওরোপিয়রা বেদ লিখে অন্ধকারে পড়ে থাকা মানুষদের আলোয় এনে সিন্ধুপাড় ছেড়ে গিয়েছিল, তারা মধ্যযুগে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভারতবর্ষে তাদের তৈরি সভ্যতার পতন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে মানুষের ভাল করার জন্যে ফিরে আসে, যে সময়কে বিদ্বেষীরা উপনিবেশ বলে, সজ্ঞীরা বলে উপনিবেশ মুক্তির সময়, যে জন্যে তারা মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেয় নি। মুক্তির দিশারী ইওরোপিয়রা অন্ধকারের প্রতিভূ মুঘল/নবাবদের ক্ষমতাচ্যুত করে, আলোর দিশা দেখায়, নবজাগরণের মাধ্যমে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রোজগেরে মহিলা আর অভদ্রবিত্তকে শহরচ্যুত করে, প্রগতিশীল ভদ্রবিত্তের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করা মহিলাদের পুড়িয়ে মারার জন্যে ভদ্রলোকেদের উৎসাহিত করে - জোর গলায় একে বলা হবে সতীদাহ, আবার কয়েক দশকের মধ্যে সতীদাহকে গালি দিয়ে মহিলাদের উদ্ধার করা হল রামমোহনকে মহান বানিয়ে। শেষের দিকে সভ্য ইওরোপ অনুগামী ভদ্রবিত্তের হাতে ক্রমশ ক্ষমতা দিয়ে বলল আমরা উপনিবেশিক প্রগতিশীলতায় যেমন সরকার চালিয়েছি, তোমরাও সে রকমভাবে চালাবে। মেয়েদের হাত থেকে কেন সরকার ট্যাক্স নেবে? কেন মেয়েরা জমিদারি সামলাবে? কোন অধিকারে সে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে? কেন সম্পত্তির অধিকার রাখবে? তাদের জন্যে রক্ষণীয়া পরিবেশ তৈরি কর। যাদের রক্ষিত হওয়াই ভবিতব্য, তাদের সম্পত্তি, পাবলিক প্লেসে কাজকর্ম করার কী প্রয়োজন? হ্যালহেদ বললেন মহিলাদের পুরুষ দেখলেই সেক্স করতে ইচ্ছে হয়। তাকে অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দাও, আর সে যদি অন্তঃপুরে ঢুকতে না চায়, প্রতিবাদ করে, জোর করে চিতায় তোল। সময়ে সময়ে তোমাদের এডভাইস দেব তোমরা যাতে আর অন্ধকার যুগে ফেরত না যেতে পার, সেটা সভ্যতা বিস্তারক হিসেবে আমাদের দেখা অবশ্যকর্ম। বিশ্বকে উদ্ধার করতে ইওরোপ আজও ক্রুসেডে ব্যস্ত। ইওরোপ স্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘ বিস্তারক পদ তৈরি করেছে। এই হল প্রাচ্যবাদ। আর সব

আলোচনা ফক্কা।

ফিরি আগের আলোচনায়। অমিয় সেন লিখছেন ১৯১৩য় বিপিন পাল মনে করছেন, 'জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যেমন স্বাধীনতা জরুরি, একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাও আশু কর্তব্য।' কেশবচন্দ্রের সমসাময়িকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমালোচনা করে প্রশাসনে আরও বেশি ভারতীয়র অংশগ্রহনের দাবি তুলেছেন। তারাও ব্রিটিশ শাসনমুক্তির দাবি জানান নি। প্রথম দিকে কংগ্রেসেরও একই অবস্থান ছিল। মূল শাসকেরা সাত সমুদ্রাপারে থাকলেও ব্রিটিশ শাসনে উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তরা আনুগত্যমুক্তি চান নি। এই অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্য ক্ষমতা কেন্দ্র আর্যতত্ত্ব বিস্তার ঘটিয়েছে। ডেভিড কফ বলছেন ব্রাহ্ম সার্বজনীনতাকে উপহাস করেছে বিপুল এশিয়দের প্রতি জাতিবিদ্বেষ এবং কৃষ্টিনির্ভর সাম্রাজ্যবাদ the alarming increase of yellow dog racism and cultural imperialism ultimately made a mockery of Brahmo universalism।

মুলারের আর্যতত্ত্ব খ্রিষ্টিয় মিশনারিরাও দ্বিধাহীনভাবে অনুসরণ করেছে। রোমিলা থাপার বলছেন, মুলারের বই ভারতবর্ষে পড়া হত। বহু প্রভাবশালী প্রকাশক তাঁর বই ছাপতেন। এছাড়া বহু আর্যতত্ত্ব অনুগামী তাঁর তত্ত্বে বই লিখেছেন যেমন জন মুইর 'অরিজিনাল সংস্কৃত টেক্সটস' আর জন উইলসন 'ইন্ডিয়ান কাস্টস'। দুজনই খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক। জন মুইর আর জন উইলসন ব্রাহ্মণদের হাতে নিপীড়িত সমাজের নিচুতলার মানুষদের সমস্যা তুলে ধরে দাবি করতেন এই নিপীড়ন বৈদিক আমল থেকেই চলে আসছে। মুলারের আর্যতত্ত্ব তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের আন্দোলনে সাহায্য করেছে। আর্যতত্ত্ব নির্ভর করে তারা বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে গলা তোলার সুযোগ পেল। জ্যোতিরাও ফুলে লিখলেন, আর্য আক্রমণে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো জাতিতে ভাগ হয়ে যায়, বিজয়ী আর্যরা পরাজিত অনার্যদের স্থায়ীভাবে দলিত করে রেখেছিল।'

সিপাহি যুদ্ধের ব্রিটিশ সেনানায়ক লর্ড লরেন্সের সঙ্গে কেশবের সুমধুর সম্পর্ক এবং ব্রাহ্মদের ভারতীয় ধর্ম সংস্কার উদ্যমের সংবাদ বরাবরই ব্রিটিশ সরকারি প্রচার যন্ত্র তাদের মত করে বিশ্বময় ছড়িয়ে বোঝাতে চেয়েছে বিদ্রোহ বা কুসংস্কার দূর করার উদ্যম সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের প্রজারা তাদের সঙ্গেই রয়েছে। কংগ্রেসে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের অংশগ্রহণকে উদারপন্থী এবং যুক্তিবাদী রাজনীতিকদের মধ্যে সেতু তৈরির ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে দেখা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রবিত্ত পেশাদারেরা ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও, তাদের চোখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গলতিগুলো লুকোনো থাকছিল না। এই পরিবেশে বিশ্বধর্ম হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজ, ভদ্রবিত্ত সমাজে

গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছিল দ্রুত। কোলেট লিখলেন, 'আমরা এক সময় ব্রাহ্মসমাজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম, এবং বহু কিছু আশা করেছিলাম বলেই আমরা ব্রাহ্ম সমাজের পতনে গভীরভাবে অনুতপ্ত। এক সময় ব্রাহ্ম ধর্ম ছিল যুক্তিবাদী, আধ্যাত্মিক এবং সরলতায় মহত্তর; এখন রহস্যবাদ, অযৌক্তিকতা আর আনুষ্ঠানিক মূর্খতায় পর্যবসিত হয়েছে।' কোলেট দুঃখ করে 'দ্য ব্রাহ্ম ইয়ারবুক'এ বলছেন তিনি দেখছেন কীভাবে কেশব আস্তিকতা থেকে কুসংস্কারে ডুবে যাচ্ছেন।

১৮৭৯এ কেশবচন্দ্রের নব্য নববিধান, নিউ ডিসপেনসেসানে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্যের বাণীই জেগে রইল। কেশবচন্দ্র এবং তার অনুগামীদের ধর্ম আন্দোলন নতুন খাতে বইল কোচবিহারের রাজবাড়িতে কেশব কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ ঘটনায়। অভিযোগ উঠল কন্যার বিবাহে কেশবচন্দ্রের অনুমোদিত বিবাহ আচার ১৮৬০ এবং ১৮৭০ দশকের আদর্শের বিপরীত বলেই ব্রাহ্মধর্মে প্রগতিশীলতার মৃত্যু ঘটছে। আবারও দল ভাঙল; ১৮৭৮এর মে মাসে তৈরি হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটছে। জাতীয়তাবাদের রমরমা কেশবচন্দ্রের আর্যতত্ত্ব নির্ভর জাতভিত্তিক রাজনীতিজাত অসামান্য মনোহারিনী জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাচ্ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোষ্ঠীর হিন্দু ব্রাহ্ম জাতীয়তাবাদ প্রচারে নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপার ১৮৬৫ থেকে কেশবের বিশ্বায়িত ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়মিত কামান দাগাছিলেন। এই ঘটনাও ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রবিত্তের মধ্যে কেশব অনুগামিতায় চিড় ধরানোর জন্যে যথেষ্ট ছিল। সে সময় কেশবচন্দ্রের রাণীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে বলা হল ব্রাহ্মরা, ব্রাহ্মনীতি অনুমোদিত শাসনতন্ত্রকে স্বাগত জানায়, কিন্তু ব্রাহ্ম নীতির বিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে Brahmos welcome the co-existence of Brahmo principles with governance, but oppose all governance in conflict with Brahmo principles।

সাধারণত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে সেই তত্ত্বের একজন/দল উদ্ভাবক, তত্ত্ব প্রচারক এবং তত্ত্ব গ্রহীতার একযোগে তত্ত্বটিকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে। আর্য অভিবাসন তত্ত্ব, যাকে আমরা আর্যতত্ত্ব নাম দিয়েছি, তার সঙ্গে জুড়েছিল মূলত প্রাচ্যবাদী, সমাজসংস্কারক ব্রাহ্ম সমাজ, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে খ্রিষ্টিয় মিশনারি দল এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যস্বার্থী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। পশ্চিম ইওরোপের নানান দেশের প্রাচ্যবাদী শুরুর সময়ে আর্যতত্ত্বকে রূপদান করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে আর্যতত্ত্বকে নতুন করে গড়ে তোলেন প্রাচ্যবাদী শিক্ষক ম্যাক্সমুলার। তিনি আজও বিশ্বজোড়া আর্যতত্ত্বের প্রধান মুখ। আর্যতত্ত্বকে আন্দোলনের রূপ দিয়ে ছিলেন দেশিয় নানান

ধরণের সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনে জুড়ে থাকা গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজ। আর্যতত্ত্ব ভারতবর্ষে ছড়ানোর কাজ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অবশ্যই খ্রিষ্ট মিশনারিরা। ঠিক হোক ভুল হোক, আর্যতত্ত্ব নির্ভর করে মুলার এবং কেশবচন্দ্র যৌথভাবে ইওরোপ এবং এশিয়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া ভ্রাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছিলেন। এর ফায়দা তুলেছে প্রধাণত ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অনেক সময়েই খ্রিষ্ট মিশনারিরা। আর্যতত্ত্বের আদৌ ভিত্তি আছে কীনা এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

কিন্তু একথা স্পষ্ট বলা যায় উনবিংশ শতাব্দে আর্যতত্ত্ব ভারতভূমিতে ব্রাহ্মদের উদ্যোগে প্রচারিত হয়েছিল কোনও রকম প্রতিবাদ ছাড়াই, সফলভাবে। ব্রাহ্ম সমাজের গোড়াপত্তন করেন রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু তাকে গণরূপ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তার নেতৃত্বে অন্য ব্রাহ্ম নেতৃত্ব আর্যতত্ত্বের অন্যতম উদ্গাতা মুলারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কেশবিয় আর্যতত্ত্বকে ভারতভূমিতে প্রচার দেন। বিভিন্ন সময়ে আর্যতত্ত্বর সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রত্যেক গোষ্ঠী আর্যতত্ত্বকে তাদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখছেন ইয়ং বেঙ্গল কেশবচন্দ্র, খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে মধ্যপথ অনুসরণ করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্রের অনুসারীরা ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করতে কেশবচন্দ্রের বাগ্মীতাকে হাতিয়ার করে ভারতবর্ষীয় এবং ব্রিটিশ জনগণকে আকৃষ্ট করেন। কেশব যুগে কলকাতার ভদ্রবিত্ত অভিজাত সমাজকে প্রভাবিত করতে স্বয়ং কেশবচন্দ্র তার ব্রান্ডের আর্যতত্ত্ব হাতিয়ার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কেশব যখন রাজনীতি শুরু করেন, সে সময় মেকলেবাদের চরম রমরমা, যখন তিনি প্রয়াত হন, তখন মেকলের আশীর্বাদধন্যদের তৈরি নব্য জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়। প্রত্যেক প্রবক্তা তাদের স্বার্থপূরণে আর্যতত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্ব হিসেবে প্রচার দিয়েছেন। এই অবস্থানকে মান্যতা দিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা। ভারতবর্ষে প্রথম দিকে যারা আর্যতত্ত্বের প্রচলন করলেন তাদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী। বারবার প্রশ্ন উঠেছে কারা আর্য আর কারা নয় বা ইওরোপিয় আর্যরা না কী যারা ভারতে অভিবাসিত হয়েছিল তারা শ্রেষ্ঠ। সমস্যা হল, আর্যতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক খোঁজ আজও অধরা। আজও সমান বিতর্কিত।

শেষ বয়সে জনগণের ওপরে কেশবচন্দ্রের প্রভাব দৃশ্যত কমছিল; কিন্তু আর্যতত্ত্বের রেশ প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবি মহলে আজও সজীব। আর্যতত্ত্ব প্রচার, প্রসার, স্থায়িত্বে কেশবচন্দ্রের প্রভাব আজ এতটাই গুরুত্বের যে এখনও প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় দল/গোষ্ঠীকে আর্যতত্ত্ব বিষয়ে নির্ণায়ক অবস্থান নিতে হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই। ১৯৪৭ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রনির্মাণ এবং

রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে আর্যতত্ত্বের প্রভাব অসীম। মুলার শেষ বয়সে পুত্রসম আর্যতত্ত্বের দাঁত নখ উপড়ে নির্বিষ করলেও শেষ পর্যন্ত আর্যতত্ত্বের আকার কী হবে সে বিষয়ে দোদুল্যমান ছিলেন। আধুনিককালে আর্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তার দ্বিধা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর্যতত্ত্বকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার, সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার কাজে সফল হয়েছে। খ্রিষ্ট মিশনারি, প্রাচ্যবাদী এবং ব্রিটিশ সরকার যৌথভাবে মুলার এবং কেশবচন্দ্রের এই তত্ত্বকে তাদের স্বার্থে বারংবার ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বাড়াবার লক্ষ্যে, ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্য হিসেবে বিশ্বজুড়ে প্রচার পেয়েছে।

অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার প্রতি কেশবচন্দ্রের তীব্র আকর্ষণে বিরক্ত মিশনারিরা মনে করত ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মপ্রচারের উপযুক্ত হাতিয়ার একমাত্র কেশবচন্দ্রই। তিনি প্রাচ্যবাদীদের বন্ধু, কিন্তু প্রাচ্যবাদের তাকে দেওয়ার মত কিছু ছিল না। খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছে পারিবারিক অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করবেন। ব্রাহ্ম সমাজের, সাধারণভাবে ব্রাহ্ম গোষ্ঠীগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই পর্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানটা হল কোচবিহারের রাজবাড়িতে কেশব কন্যা সুনীতি দেবীর বিয়ে। কলকাতার ব্রিটিশনিষ্ঠ ভদ্রবিত্ত অভিজাত পরিবার আর রাজপরিবারের হাইপ্রোফাইলতম বিয়েতে ঘটকালি করে স্বয়ং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তারা এই বিবাহে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে এটা জেনেই যে এই ঘটনায় সাম্রাজ্যের অন্যতম সঙ্গী কেশবচন্দ্রের ভাবমূর্তি ধাক্কা লাগবে এবং তাঁর হাতে তৈরি সংস্কার আন্দোলন পথচ্যুত হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশিক প্রকল্প সফল করতে দেশিয় রাজারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে থাকা রাজত্বগুলোকে স্বাধীন দেশিয় রাজত্ব হিসেবে ইতিহাস অভিহিত করলেও রাজাদের স্বাধীনতার মাত্রা আন্দাজ করি কোচবিহারকে আধুনিকতার ছাঁচে ঢালার ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিকটু সভ্যতা বিস্তার উদ্যমে এবং সে সময়ের প্রগতিশীল ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী, কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের বিবাহে সাম্রাজ্যের অগ্রণী ভূমিকায় এবং কোচবিহার রাজের ব্রিটিশ প্রস্তাবকে মান্যতা দেওয়ার মাধ্যমে। ১৮৮০তে মুলারকে প্রতাপচন্দ্র লিখলেন বিবাহের জন্যে কেশবচন্দ্র যে সব সংস্কার আচার উদ্ভাবন করছেন, তাতে তিনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন। ১৮৮১তে আবার লিখলেন 'কেশবচন্দ্র ক্রমশ আধ্যাত্মিক পথে যাচ্ছেন, জনগণের ইচ্ছে অনিচ্ছে চাহিদা আন্দাজ করতে পারছেন না, আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

এই বিবাহের রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে আমরা পরের পর্বের আলোচনায়

দেখব। দেখব কীভাবে উপনিবেশিক আর্যতত্ত্ব প্রচারে কেশবচন্দ্রকে কাছে টেনে তার বিশ্বপরিচিতি তৈরি করে সাম্রাজ্যের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক ভদ্রবিত্ত দল তৈরি করেছে এবং সাম্রাজ্যের প্যাক্স ব্রিটানিকা নীতি প্রচারে, তাঁরই উদ্যমে তৈরি বাল্য বিবাহ আইন যেমন ভাঙতে বাধ্য করেছে তেমনি বাধ্য করেছে রাজবাড়ির শর্তে অধিকাংশ অব্রাহ্ম বিবাহ আচার মেনে নিতে। কেশবচন্দ্র অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করছেন। বিবাহের পরে বেশি দিন তিনি বাঁচেন নি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘটকালি আর প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্প

> “১৮৭৭খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে আনিত হন। উক্ত সনের ১ লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লি নগরীতে যে প্রসিদ্ধ দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ভারতেশ্বরীর নামযুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানিন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাদুর, মহারাজকে এক মূল্যবান্ তরবারি প্রদান করেন। ১৮৭৮ অব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা, সুনীতি বালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয়। ১৫ই মার্চ তারিখে মহারাজ ইংলন্ডে চলিয়া যান। অনধিক এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি রাজবাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংলন্ডে অবস্থানকালে তিনি মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে, বিশেষ বন্ধু ভাব হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তিনি স্বরাজ্যে পুনরাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন।”
>
> ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহারের ইতিহাস

প্রথম পর্বে দেখেছি কীভাবে প্রাচ্যবাদী আর্যতত্ত্ব প্রচারে ব্রাহ্ম নেতা কলকাতার অভিজাত কোলাবরেটর পরিবারের সন্তান কেশবচন্দ্র সেন আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উপনীত হওয়া অলিখিত সমঝোতা সিদ্ধান্ত ছিল - ব্রাহ্ম সমাজ নেতা কেশবের জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষজুড়ে ১০১ টি শাখায় ছড়িয়ে থাকা ব্রাহ্ম ভদ্রবিত্তের সাম্রাজ্যমুখীনতা, সাম্রাজ্যনির্ভরতা নিশ্ছিদ্র করবে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক থাকবন্দীতে চাকরি, দালালি আর উঞ্ছবৃত্তির সুযোগ করে দেবে; অপরপক্ষে সাম্রাজ্য প্রকল্পের সক্রিয় সঙ্গী হয়ে কেশবচন্দ্র ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রখ্যাততম ধর্মগুরু হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশভূমিকে পরোক্ষে বিপ্লব প্রচেষ্টামুক্ত করতে সাহায্য করবেন। কেশব অনুগামী ভদ্রবিত্তকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উদার হাতে চাকুরী উমদোরি দালালিতে লালন পালন করল। বিনিময়ে সমাজ নেতার জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্য স্বার্থে ব্যবহার করেছে প্যাক্স ব্রিটানিকা নীতিমালা। প্রকল্পের অংশ হিসেবে মেট্রোপলিটনের সভ্যতা,

উপনিবেশে আমদানি প্রকল্পে সমাজপতি কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের যুবরাজের বিবাহ নিশ্চিত করা হল। ব্রাহ্ম সমাজের বহু কর্তাব্যক্তি কেশব কন্যার বিবাহের উদ্যমে ক্ষুব্ধ হয়ে দল ছাড়লেও কেশবকে সেই প্রকল্প ভগবৎ ইচ্ছার দোহাই দিয়ে, নিজের জনপ্রিয়তা জলাঞ্জলি দেওয়ার সম্ভাব্যতার মাথায় রেখেও সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশিক প্রকল্প সফল করতে পলাশী উত্তর সময়ে ভদ্রবিত্ত সমাজের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকৃত দেশিয় রাজা জমিদার বড় ভূমিকা পালন করেছে। কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য হলেও সীমান্ত রাজ্য হওয়ায় নামমাত্র রাজস্ব দিয়েছে এবং সশরীরে মুঘল দরবারে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। পলাশীর পরে কোচবিহারের রাজপরিবার ভূটান রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তা বিধানে কোচবিহার রাজ ব্রিটিশ রাজত্বের অনুগামী হয়। ১৭৭৩এর ৫ এপ্রিল কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে চুক্তি স্বাক্ষর করেন নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে নাজিরদেব খগেন্দ্রনারায়ণ। এদিন থেকে ব্রিটিশদের অধীনে স্বাধীন করদ রাজ্য কোচবিহার সুরক্ষায় ব্রিটিশ সৈন্য-ব্যারাক তৈরি হল।

সিপাহি যুদ্ধের স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষমতাচ্যুতির আতঙ্ক সাহেবদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল; সিপাহিদের ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে বহু রাজপরিবার অংশ নিয়েছে। দেশিয় রাজাদের প্রতি তীব্র অবিশ্বাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কর্তারা আরও বেশি ভদ্রবিত্তকে প্রশাসনিক কাজে জুড়ে, কোচবিহারের মত পুরোনো অনাধুনিক ধ্যানধারণা, আচার আচরণ, রীতিনীতির বাহক রাজপরিবারগুলোকে আধুনিকতা অনুসারী অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থবাহী করে তোলার উদ্যম নেয়। রাজ্য হারানো শিখদের সাম্রাজ্য সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসন দিয়ে, প্রভুভক্ত গুর্খা বাহিনী সম্বল করে প্রায় হারতে বসা যুদ্ধে তোপের সামনে অকুতোভয়ে প্রাণ দেওয়া 'নেড়ে প্যাঁজখোর'দের বিরোধিতায় সাম্রাজ্যলুঠখুনঅত্যাচারপন্থাকে নিঃশর্ত সমর্থন দিল চাকুরে, দালাল এবং উঞ্ছজীবি ভদ্রবিত্ত বাঙালি। প্রতিদানে যুদ্ধের ৭ বছরের মধ্যে ১৮৬৪তে সাম্রাজ্যবন্ধু দ্বারকানাথের নাতি, দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় আইসিএস হলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম লগ্নে উইলিয়াম জোন্স বামুনদের পুনর্বাসন দিতে না পেরে কাবাবদের [ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ] দিয়ে কাজ চালিয়ে সাম্রাজ্যের লুঠ স্বার্থপূরণ করার উদাহরণ পেশ করেছেন। সিপাহি যুদ্ধে রাণীর চরণে বিনাশর্তে প্রণিপাত হওয়া ইউনিটেরিয়ানদের গুডবুকে থাকা কেশবচন্দ্রের মত প্রখ্যাত ভদ্রবিত্তকে কাজে লাগিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপূর্ব রাজত্বে প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রয়োগের নীতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বদ্ধপরিকর হয়ে কোমর বাঁধল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব এবং বিস্তৃতিতে প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আদিবাসী মানসিকতার কোচবিহার রাজের পিছয়ে পড়া পরম্পরায় বিতশ্রদ্ধ ব্রিটিশ সরকারের নিয়োগ করা আমলারা ইওরোপিয় রীতিনীতি অনুসরণের জন্যে চাপ তৈরি করছিল। বালক রাজা সিংহাসনে আরোহন করায় উপনিবেশিক প্রথা অনুযায়ী তাকে একজন ব্রিটিশ প্রশাসক বা রেসিডেন্ট কমিশনারের অধীনে থাকতে হচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আধুনিক আদবকায়দায় রপ্ত করে তুলতে, রাজমহলের মহিলাদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রথমে বেনারসের ওয়ার্ড ইন্সটিটিউট, পরে পাটনার বাঁকিপুর কলেজে শেষে উচ্চতর সভ্য শিক্ষা অর্জনে লন্ডনে পাঠানোর সরকারি সিদ্ধান্ত নেয়। রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাজা আর রাজত্বের আধুনিক সাজে সেজে ওঠার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিতে বাধ্য করে। আধুনিক ব্রিটিশ সভ্যতা প্রসার প্রকল্পের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল প্রগতিশীল কেশব কন্যা সুনীতি দেবীকে কোচবিহার রাজপরিবারে বিয়ে দেওয়া।

ভবানীচরণের কোচবিহারের ইতিহাসের খণ্ডিত বক্তব্যে স্পষ্ট রাজাকে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঝাঁকি ভ্রমণ করিয়ে আধুনিকতার প্রথম পাঠের মগজ ধোলাইএর পরিকল্পনা করা হল এবং উপনিবেশের লুঠেরা সাম্রাজ্যবাদী নবজাগরণী মানসিকতা তৈরির প্রথমতম শিক্ষাকেন্দ্র প্রেসিডিন্সিতে কলেজে আইন বিভাগে পাঠ নেওয়ার জন্যে ভর্তি করানো হল।

১৮২০ থেকেই সাম্রাজ্যে নানান কাজে উপনিবেশে আসা ইউনিটেরিয়ানেরা সাম্রাজ্যের সভ্যতা বিস্তারী নীতি প্রসারের কাজে ব্রাহ্মদের ওপর আস্থা পেশ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মত যুগপুরুষ প্রফেটের উত্থানে ব্রিটিশ বিশ্ব ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা আখ্যা দিয়ে আশা করছিলেন তাঁর ব্রিটেন ভ্রমণ 'আমাদের ধর্মের ইতিহাসে' মাইলস্টোন হবে। ১৮৭০ এবং ১৮৮০র দশক থেকে প্রথমে ইউনিটেরিয়ানদের সংবাদপত্র পরে সাম্রাজ্যবাদী দৈনিকগুলোও ব্রাহ্মদের বিশেষ করে 'প্রগতিশীল' কেশবচন্দ্র গোষ্ঠীর কাজকর্ম আর কোচবিহার বিবাহকাণ্ডকে সংবাদপত্রে ঠাঁই দিতে থাকে অতি উৎসাহে, সাম্রাজ্য বিস্তারী প্রকল্পের অংশ হিসেবে।

১৮৭৭র আগে পর্যন্ত উপনিবেশিক ধর্মসংস্কার আন্দোলনে কেশবচন্দ্র খ্যাততম ব্যক্তিত্ব। 'সংস্কার আন্দোলন' উপনিবেশিক এজেন্ডা। সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী 'প্রগতিশীল' রীতিনীতি সমাজে প্রোথিত করে, সমাজকে আধুনিক করে গড়ে তোলা হয়। সেই কাজে প্যাক্স ব্রিটানিকার নীতি

ইওরোপিয়তা প্রসার অন্যতম হাতিয়ার ছিল। উপনিবেশিক সময় জাতিরাষ্ট্র তৈরির আগে সংস্কার আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না; উপনিবেশপূর্ব যে সব আন্দোলনের ওপর সংস্কার আন্দোলনের লেবাস পরাই, সে সব আন্দোলন আদতে উপনিবেশিক ইতিহাস আর যুক্তি দিয়ে উপনিবেশপূর্ব সময়কে দেখার চেষ্টা। ১৮৬০ এবং ৭০এর দশকে ব্রাহ্ম যুক্তিবাদের সঙ্গে বঙ্গীয় ভক্তি পরম্পরাকে মিলিয়ে পুরোনো ব্রাহ্ম সমাজের কাঠামোর ওপর নতুন ধরণের সমাজসংস্কার এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনার উদ্দেশ্য ছিল প্যাক্স ব্রিটানিকাকে বাংলার মাটিতে পোঁতা। ভদ্রবিত্ত স্বার্থবাহী সমাজ সংস্কারের ঝাড়ু চালাতে ইন্ডিয়ান রিফর্মস এসোসিয়েসন গঠন হল, মেকলিয়পন্থায় কোলাবরেটর তৈরি করতে ইংরেজি বিদ্যালয় তৈরি হল, সাম্রাজ্যমুখী সংবাদপত্র তৈরি হল এবং তৈরি হল দাতব্য সংগঠনও। সাম্রাজ্য জানত ভদ্রবিত্তদের স্বার্থরক্ষাই হল সাম্রাজ্য স্বার্থ পূরণ/ কেশবচন্দ্রের মত ইয়ং বেঙ্গলিরা বুঝতেন, বোঝাতেন তাঁরা কেন সাম্রাজ্যপক্ষীয়।

১৮৭৮এ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ১৩ বছরের কন্যা সুনীতি দেবী এবং কোচবিহারের ১৫ বছরের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়নের বিবাহ প্রস্তাবে কলকাতার ব্রাহ্ম পরিমণ্ডল আবারও দ্বিধাবিভক্ত হয়। অভিযোগ হাইপ্রোফাইল বিবাহ কেশবচন্দ্র সেনের প্রণয়ন করা ১৮৭২এর ব্রাহ্ম বিবাহ আইন উল্লঙ্ঘন করেছে - বিবাহে বর বউ দুজনের বয়স আইন অনুমোদিত নয়। এই বিবাহে ব্রাহ্মসমাজে সদস্য হ্রাস পেল। গবেষক রোচনা 'মজুমদার ম্যারেজ এন্ড মডার্নিটি - ফ্যামেলি ভ্যালুজ ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' বইতে মন্তব্য করছেন সুনীতি-নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিবাহ উপনিবেশিক ভারতে বিতর্কিততম বিবাহগুলির মধ্যে একটি। বিবাহ বিষয়ে তিনি বিশদে আলোচনা করেছেন - তাই প্রবন্ধে সামাজিক প্রভাব বুঝব। দেখব বিবাহ বিতর্ক ধার্মিক, সামাজিক সঙ্গঠনগুলিকেই শুধু প্রভাবিত করল না, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ঘটকরা উপনিবেশে প্রগতিশীল রেণু রোপন করারও জোরালো দাবি তুলল। আতান্তরে পড়ে কেশবচন্দ্রের দীর্ঘকালের বন্ধু ইউনিটেরিয়ানরা বিবাহ উদ্যমের নিন্দা জানাল।

এই প্রবন্ধে আমরা উপনিবেশিক সভ্যতা বিস্তারে চুম্বকে উপনিবেশ আর মেট্রোপলিটনের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করব। ১৮৬০ থেকে কেশবচন্দ্র বাঙলা ইংরেজি উভয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে ধর্মমত প্রকাশে উদ্যমী হয়েছিলেন। তারই দেখানো পথে বিরোধী পক্ষও দুই ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, ইন্ডিয়ান মিরর থেকে ইংলন্ডের ইউনিটেরিয়ান এবং অন্য প্রতিবাদী সংবাদপত্রে বিবাহ এবং অন্য ব্রাহ্ম সংবাদ প্রকাশ করে। ইংলন্ডের সংবাদপত্রগুলো বিবাহ সংবাদে আগ্রহী হল। এন্টোনেট বার্টন বলছেন ব্রিটেনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বজুড়ে সভ্যতা বিস্তারী প্রকল্প সফল করা। সেই যুক্তিতে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের ধামাধরা সংবাদপত্রগুলোর কাছে এই বিয়ে ট্রান্সন্যাশনাল ঘটনা। বিয়ে বিতর্কে সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে জড়াল কলকাতা শহরের ইংরেজি শিক্ষিত সংখ্যালঘিষ্ঠ অভিজাত ব্রাহ্ম, মিশনারি গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যস্বার্থ পূরণে সংবাদপত্র জগৎ, ব্রাহ্মদের মতই লন্ডনের সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু প্রভাবশালী ইউনিটেরিয়ান গোষ্ঠী।

বিয়ের ঘটনাবলী নিয়ে বিশদে লিখেছেন কেশবচন্দ্র ঘনিষ্ঠ এবং ছায়াসঙ্গী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বহু ব্রাহ্ম পণ্ডিতও। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সরকারিস্তর থেকে বিবাহ ভাবনার প্রথম সংবাদ পাওয়া প্রতাপচন্দ্র মনে করতেন কোচবিহারে কেশবচন্দ্র বিয়েকাণ্ডে অসম্মানিত হবেন। ডেভিড কফ বলছেন মেয়ের বিয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ধ্বংসের বার্তা বয়ে এনেছিল। থিওডোর কোডিশেক বলছেন বিবাহ কাণ্ডে সমর্থন দেওয়ায় কেশবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল অনাধুনিক, পিছিয়েপড়া দেশিয় রাজ্য কোচবিহারে ব্রাহ্ম প্রভাব বিস্তার, বলা ভাল প্যাক্স ব্রিটানিকার ভিত্তি তৈরি করা। রোচোনা মজুমদারের বক্তব্য কোচবিহার বিবাহ উপনিবেশিক আমলে আধুনিক আইনিসিদ্ধ বিবাহরীতির সঙ্গে প্রাচীন ধরণের বিবাহরীতির দ্বন্দ্ব।

স্পষ্ট অস্বস্তিতে থাকা প্রতাপচন্দ্র নেতার পাশে থাকলেও অন্য ব্রাহ্ম অনুগামী কেশবের বিরোধিতা করলেন। বিরোধীরা বললেন কেশব কোচবিহার রাজবাড়িতে যে শর্তে বিবাহ দিয়েছেন, সেটা ব্রাহ্ম রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং এই বিবাহে কেশবের সম্মতি প্রদান আদতে ব্রাহ্ম আন্দোলনে তার দ্বিচারিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বাংলার ব্রাহ্ম সাহিত্যে কেশবচন্দ্র বর্জনের যুগ শুরু হল। সোফিয়া ডবসন কোলেটের 'দ্য ব্রাহ্ম ইয়ার বুক' ছিল ব্রিটিশদের কাছে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিষয়ে প্রধান জ্ঞানসূত্র। তিনিও কোচবিহার বিবাহের পরে তার পত্রিকায় কেশবকে নাম নেওয়া বন্ধই করলেন। উইলিয়াম রাদিচে, 'রেলিজিয়ান অব ম্যান'এ লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০এ ব্রিটেনে হিন্দু এবং ব্রাহ্ম সংস্কার বিষয়ে বলতে গিয়ে তার বাল্য বয়সে সব থেকে বিখ্যাত ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের নাম নেন নি। ব্রাহ্ম, এবং তাদের সমর্থকদের এক বড় অংশ কেশবের এই পদক্ষেপ মেনেনিতে পারেন নি।

১৮৭৭এ প্রতাপচন্দ্র জানতে পারেন ব্রিটিশ সরকার কোচবিহারে রাজার বিবাহের জন্যে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর কথা ভেবেছে। সাম্রাজ্য বিশ্বাস করত কোচবিহারের মত পশ্চাদপদ রাজপরিবারে আদিবাসী রীতিনীতি ভাঙতে রাজাকে শুধু ব্রিটিশ পদ্ধতিতে পড়িয়ে ইওরোপিয় দেশগুলোতে ঘুরিয়ে আনলে অথবা অন্য রাজপরিবারের কন্যা বিয়ে দিলেও সভ্যতা বিস্তার লক্ষ্য পূরণ হবে না। প্রয়োজন ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রকাশ্যে শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করা এমন এক প্রগতিশীল পরিবার বেছে নেওয়া, যে পরিবারের সামাজিক অর্জন রাজপরিবারের

থেকে কম নয়; যে পরিবারের কন্যা মেকলে পদ্ধতিতে শিক্ষিত; যে সাম্রাজ্যের আদব কায়দায় অভ্যস্ত; যে কন্যা প্রকাশ্যে বেরোতে দ্বিধা করে না এবং সাম্রাজ্যের প্রধান ঘটদের পরিচিত; যে কন্যা রাজ পরিবারের জেনানার প্রাচীনপন্থী পরম্পরার ওপরে আধুনিক আচার আচরণ সহজে চাপাতে সমস্যায় পড়বে না। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালকদের মনে হল পিছিয়েপড়া কোচবিহার রাজত্বে দীর্ঘস্থায়ী প্যাক্স ব্রিটানিকা চাপানোর প্রথম এবং একমাত্র চয়েস সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতায় বেড়ে ওঠা সুনীতি দেবী। সুনীতি দেবী হলেন ব্রিটিশ আধুনিকতা গবেষণাগারের জীবন্ত হাতিয়ার।

ব্রিটিশ সরকার কেশবচন্দ্রকে বিবাহ প্রস্তাব পাঠালেন। ১৮৭৮এর ২২ জানুয়ারি ডেপুটি কমিশনার ডাল্টন কেশবচন্দ্রকে জানালেন রাজা মার্চে ইংলন্ডে পড়াশোনা করতে যাবেন, লেফটানেন্ট গভর্নরের একান্ত ইচ্ছা, রাজা ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে বাগদানের শুভ কাজ সেরে ফেলা। সমস্যা হল তখনও কেশব কন্যা ১৪ও নয়, বরের বয়স ১৫। বিবাহে প্রগতিশীল কেশবচন্দ্রের আপত্তির কথা আন্দাজ করে ডাল্টন আশ্বাস দিলেন ছোট অনাড়ম্বর গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান আয়োজন করে নিয়মরক্ষার বিবাহ হবে। শুধুই বাগদান অনুষ্ঠান। ব্রিটিশ সরকার একান্তভাবে চায় উভয়ের যথোপযুক্ত বিবাহের বয়স হলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক। সরকার কেশবচন্দ্রকে বোঝাল এই বিয়ের ফলে প্রথমে কোচবিহারে পরে ভারতবর্ষজুড়ে ব্রাহ্মবাদ আলোক বিস্তারী হবে।

বিবাহের দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পরে কোচবিহার রাজবাড়ি থেকে কন্যার বাড়িতে শর্ত দেওয়া হল পরম্পরার হিন্দু আচার আচরণ পালনের। ব্রাহ্ম রীতিনীতিতে ববাহে গররাজি রাজপরিবার। হিন্দু মতে বিবাতেই রাজমাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘটকালিতে হওয়া এই বিবাহে এবং মহারাজাকে বিলেতে যাওয়ার সম্মতি দেবেন।

গবেষক আংমা দে ঝালা দেখিয়েছেন কোচবিহারের মত বেশ কয়েকটা দেশিয় রাজত্বে উনবিংশ শতের শেষে রাজ্যের আমলাদের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলাদের মধ্যে ক্ষমতার দড়িটানাটানির খেলা শেষ হত জেনানার মহিলাদের মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে দুপক্ষের মধ্যে আপসরফা তৈরিতে। আংমার ‘কোর্টলি ইন্ডিয়ান ওমেন ইন লেট ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া’য় বলছে ১৮৭৮এ কোচবিহারের মহারাজার ব্রাহ্ম সংস্কারক কেশব চন্দ্র সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন মহারাজার ব্রিটিশ পরামর্শদাতা ডাল্টন এবং নেলার, দুই পরিবার এবং অংশিদারদের মুখোমুখি বৈঠক আয়োজন করান এবং দুই পরিবারের মতৈক্যেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্যে রাজাকে বহু বিবাহের পরম্পরা ত্যাগ করে এক বিবাহতে রাজি হতে হয়।

নাবালক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর শিশুকাল থেকেই ব্রিটিশ সরকারের নজরদারিতে বড় হচ্ছিলেন। বিবাহের আগে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবে ভেটো দেন মহিলামহল - তাদের দাবি রাজাকে বিয়ে না করিয়ে কালাপানি পার হতে দেবেন না। তখনই সাম্রাজ্য পরিচালকদের পর্দার বাইরের আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু নারীর খোঁজে সাম্রাজ্যের নজর পড়ল কেশব কন্যার ওপর। তাঁর জাত বিরোধিতা, প্রাতীচ্য অনুরাগ, সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া, খ্রিষ্টিয় সংবেদনশীলতায় সাম্রাজ্যের পরিচালকেরা মুগ্ধ ছিলেন। তাছাড়া তাঁর বাবা বহু বিবাহেতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বালক রাজা ভাবী শ্বশুরকে লিখলেন, 'প্রিয় মহাশয়, আমাকে বলা হয়েছে বহুবিবাহ বিষয়ে আমার মত আপনাকে জানাতে। উত্তরে আমি বলছি, কোনও পুরুষেরই একের বেশি বিয়ে করা উচিৎ নয়, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি এখনও এই বিশ্বাসে অনড়। আমি নিচে আমার ধর্মীয় মতামত ও মতামতের বিবৃতি দিচ্ছি - আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং অন্তরে আস্তিকতা বহন করি।'

সুনীতি দেবীর ছেঁড়া ছেঁড়াভাবে লেখা স্মৃতিকথাতেও আছে কীভাবে ব্রিটিশপক্ষীয় সমঝোতাকারী ডাল্টন এবং নেলার বার বার কেশবচন্দ্রের পরিবারকে কোচবিহারের রাজবাড়ির হয়ে আশ্বাস দিয়েছেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার। কেশবচন্দ্র আলাপ আলোচনায় ব্রাহ্ম মতে বিয়ে হওয়ার শর্ত আরোপ করলেও শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের দেওয়া বহু শর্তই মানা হয় নি। ব্রাহ্ম সংবাদপত্র সানডে ইন্ডিয়ান মিরর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল বিয়ের মঞ্চে মূর্তি/প্রতিমা রাখা ছিল, কেশবের শেষ দাবি অনুযায়ী হোম অনুষ্ঠনও হয় নি। কোচবিহার সরকারের প্রশাসনিক সমীক্ষা এবং ১৮৭৭-৭৮এর বাংলার প্রশাসনিক সমীক্ষায় স্বীকার করা হয়েছে কেশবীয় পক্ষের কিছু দাবি মেনে নেওয়া হলেও এই বিয়েকে গোঁড়া হিন্দু পরম্পরার বিয়ে হিসেবেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ইন্টারেস্টিং হল প্রাতীচ্যবাদী খ্রিষ্টিয় নীতি মেনেই কোচবিহারের মহারাজকে বহুবিবাহ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতিও শ্বশুরমশাইকে দিতে হয়েছে।

বিবাহ এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্র

তৎকালীন ব্রিটেনের ইউনিটেরিয়ান সংবাদপত্র তো বটেই অন্য ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রভূত গুরুত্বে কেশবচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে মেয়ের বিয়ের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র প্রত্যাশিতভাবেই জগত বিবাহের হিন্দু বা ব্রাহ্ম রীতিনীতি বা বাল্য বিবাহ ইস্যুগুলো এড়িয়ে বিয়ের ফলে একটি রাজপরিবারে প্যাক্স ব্রিটানিকার আওতায় আনার জন্যে সব পক্ষকে ধন্যবাদ জানায়। মেট্রোপলিটনে সমাজে মহিলাদের স্থান ছিল সমাজের সামাজিক অগ্রগতির সূচক। চিনে মহিলাদের পা বেঁধে রাখা,

ভারতে সতীদাহ, উত্তর আফ্রিকা আর আরবে মহিলাদের ভগাঙ্কুর ছেদন ইত্যাদিকে মেট্রোপলিটন সামাজিক বর্বরতা আখ্যা দিয়েছে। উপনিবেশের স্থায়িত্বের যৌক্তিকতা বোঝাতে এই চলতি 'কুসংস্কার' গুলোর সংস্কারের বাহানা বানানো হয়েছে।

সাম্রাজ্য বন্ধুত্ব ছাড়াও ব্রিটেনে রামমোহন রায়ের [অবশ্যই প্রয়াণের পরের সময়ে] প্রখ্যাতির অন্যতম কারন হল সতীর মত বর্বর প্রথার অবলুপ্তি বিরুদ্ধে লড়াই। একই সূত্রে ইংলন্ডে কেশবের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারন বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ রোধ আন্দোলন। তিনি নিজেও ১৮৭২এর ব্রাহ্ম ম্যারেজ এক্টকে নিজের রাজনৈতিক সাফল্য মানতেন। কেশবচন্দ্র ১৮৭০এ ইংলন্ডে বক্তৃতায় ব্রিটিশ জনগনকে বিবাহ আইন প্রণয়ন সরকারকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান। ১৮৭২এ আইন আনার প্রস্তাবনার পক্ষে দাঁড়াল এংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র মিশনারিদের সংবাদপত্র এবং ব্রিটেনের সংবাদপত্র। এর সঙ্গে বাল্য ও বহুবিবাহ রোধ, আন্তজাতি বিবাহ এবং বিধবা বিবাহের আইন প্রবর্তনের জন্যে সরকারকে চাপ দিতে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে কেশবকন্যার বিয়ে যদিও আইনত বাল্যবিবাহ, এবং এটি ১৮৭২এর ব্রাহ্ম বিবাহ আইন উল্লঙ্ঘন করছে, কিন্তু যখনই ব্রিটিশ সংবাদপত্র জগত কেশব কন্যার বিয়ে নিয়ে লিখেছে, তারা একে ব্রিটিশ আইনের সাফল্য এবং স্বাভাবিকভাবে উপনিবেশের সাফল্য হিসেবেই প্রচার করেছে। সাম্রাজ্য রক্ষায় ইওরোপিয়দের অনুসৃত নীতিই সভ্যতা হিসেবে উপনিবেশে পরিচিত।

ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল কেশবচন্দ্রের পক্ষে, সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে দেওয়া এই বিবাহ প্রস্তাব অস্বীকার করা অসম্ভব হবে দুটি কারনে প্রথমটি, কেশবের মত কোলাবরেটর পরিবারের সন্তানের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব অস্বীকার করা কঠিন। দ্বিতীয়ত রাজবাড়িতে বিবাহের প্রস্তাব কেশব পরিবারের পক্ষে এড়ানো অসম্ভব - কেশব যতই আন্তর্জাতিকস্তরের বিখ্যাত নেতা হোন না কেন। সরকারের সমস্যা ছিল রাজবাড়ির চাপে বিবাহকে হিন্দু পরম্পরার বিবাহ হিসেবে সফল করানো। ১৮৫৮য় ভিক্টোরিয়া ভারত অধিগ্রহণকালে, সম্রাট আকবরের মত ভারতবর্ষীয় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রজাদের কোনও রকম প্রথায় তার সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। মাথায় রাখা দরকার ১৮৭২এর ব্রাহ্ম বিবাহ আইন ব্রিটিশ ভারতের বাইরে কোচবিহার রাজত্বে রূপায়ণ করানোর দায় ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। অথচ বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে উপনিবেশিক সরকার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে বার বার হস্তক্ষেপ করেছে। উপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার যখন হিন্দু প্রথায় যখন কোচবিহারে রাজপরিবারের এবং কেশবচন্দ্রের মত ইংরেজি শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক

স্থাপন করে তখন তারা ১৮৫৮র ঘোষণা এবং নিজেদের তৈরি আইনকেই অস্বীকার করে সাম্রাজ্য প্রণোদিত সভ্যতা বিস্তার, প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পকে সফল করতে। কেশবের আন্দোলনের পাশে থাকা পল মল গেজেট বাল্য বিবাহে আপত্তি করে মন্তব্য করেছে, আগামী দিনে কোচবিহারের রাজা আবশ্যিকভাবে বহু বিবাহ করবেই; সাম্রাজ্য তাকে আটকাতে পারবে না। দ্য এক্সামিনার লিখল পুরোনো প্রথায় শাসন চালানো শাসকের সামনে সুযোগ এসেছে আধুনিক তরিকায় জীবনধারণ করার। ১৮৭০এ কেশবের ইংলন্ডে থাকার সময় তার প্রায় প্রতিটি দিনের সংবাদ প্রকাশ করা ব্রিস্টল মারকারি পাত্রপাত্রীর বিবাহের বয়স উল্লেখ না করেই বিবাহকে দুহাত তুলে সমর্থন দিয়ে বলেছে এই বিবাহকাণ্ড সম্মানের যোগ্য এবং ভারতের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাদের মতে কোচবিহারের মত আশ্রিত রাজত্ব ব্রিটিশ শাসনে এলে মানুষ আরও বেশি প্রগতির আস্বাদ পাবে। কেশব কন্যার বিয়েতে রাণীর প্রেরিত টেলিগ্রাম প্রায় সব সংবাদপত্রে গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়।

সরকার পক্ষ যাই বোঝাক, কেশবচন্দ্রর অনুগামীরা জানতেন, এই বিবাহে সরকারি চাহিদার আচার আচরণ মান্য করতে প্রকাশ্যে তাদের নেতার মুখ পুড়বে এবং অনুগামীদের কাছে তিনি অপদস্থ হবেন। কেশবচন্দ্রের বিরোধী পক্ষই নয়, কেশব অনুগামীদেরও অভিযোগ তার কন্যার রাজবাড়িতে বিবাহ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে লড়াই করে প্রণয়ন করা ১৮৭২এর ব্রাহ্ম বিবাহ আইন উল্লঙ্ঘন করেছে - বিবাহে বর বউ দুজনের বয়স আইন অনুমোদিত নয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও ব্রাহ্ম প্রথা মানা হয় নি। ছায়াসঙ্গী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, কেশবচন্দ্র আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি তার ক্ষতি চায় না। কেশবচন্দ্র মুলারকে চিঠিতে জানালেন, 'এই বিবাহ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ইচ্ছে অনিচ্ছে এবাবদে তুচ্ছ; তিনি নিমিত্তমাত্র - অন্ধকারে নিমজ্জিত একটা গোটা রাজ্যে প্রগতিশীল সংস্কার আনয়ন করা তার আশু কর্তব্য।' কেশবচন্দ্রের অন্য অনুগামীর মত প্রতাপচন্দ্রও জানতেন বিবাহ কাণ্ডে ব্রাহ্ম আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হওয়া আটকানো যাবে না। ১৮৮০তে মুলারকে প্রতাপচন্দ্র লিখলেন বিবাহের জন্যে কেশবচন্দ্র যে সব সংস্কার আচার উদ্ভাবন করছেন, তাতে তিনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন। ১৮৮১তে মুলারকে লিখলেন কেশবচন্দ্র ক্রমশ আধ্যাত্মিক পথে চলে যাচ্ছেন, তিনি জনগণের ইচ্ছে অনিচ্ছে আন্দাজ করতে পারছেন না he may completely elude popular understanding, and that is why I am the more anxious to explain him।

১৮৮৩তে প্রতাপচন্দ্র একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এনেকডোট বলছেন। জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমলা তাকে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বলেছেন কেশব হাজারো মানুষকে প্রভাবিত করতে পারতেন, তার সেই ক্ষমতা ছিল; কিন্তু প্রকাশ্য রাজনীতির টান তুচ্ছ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থেকে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্রিটিশদের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে। আমলার বক্তব্য থেকে কেশব কন্যার বিবাহের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। রাণীর ওয়াদা না মেনে, বিবাহ আইনে বয়সের সীমা না মেনে, সাম্রাজ্য কর্তৃপক্ষ যেনতেন প্রকারেন ইওরোপিয় প্যাক্স ব্রিটানিকার রেণুগুলো বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্বের রাজপরিবারে প্রথিত করার যে সুযোগ সাম্রাজ্য খুঁজছিল, সেটা তারা পেল কেশব কন্যার বিবাহে।

সূত্র

Arnold, David. (2000). Science, Technology and Medicine in Colonial India. The New Cambridge History of India. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Arooran, K. N. Tamil Renaissance and Dravidian Nationalism, 1905–1944. Madurai: Koodal Publishers, 1980.

Arooran, K. N. Caste & the Tamil Nation: The Origin of the Non-Brahmin Movement, 1905–1944. Madurai: Koodal Publishers

Bagal, J. C. Hindu Melar Itibritta. Maitri Publication, 1968.

Bahuguna, Tanvi. "Against Brahmanical Domination. Emergence of Anti-Brahmanic Movement in the South," MA Paper, Jamia Millia Islamia,

Basu, Rajnarayan. The Prospectus of a Society for the Promotion National Feeling among the Educated Natives of Bengal (1866), http://www.midnapore.in/people/rishi_rajnarayan_basu_prospectus_of_society.html

Beckerlegge, G. "Professor Friedrich Max Müller and the Missionary Cause." In Religion in Victorian Britain, vol. 5, Culture and Empire, ed. J. Wolffe, pp. 177–220. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Borthwick, Meredith. Keshub Chunder Sen: A Search for Cultural Synthesis. Calcutta: Minerva, 1977.

Bose, Ram Chandra. Brahmoism; or, History of Reformed Hinduism from Its Origin in 1830, under Rajah Ram Mohun Roy, to the Present Time. New York: Funk & Wagnalls, 1884

Carpenter Mary, ed. The Last Days in England of Rajah Rammohun Roy. London: Trübner & co. Calcutta:

Lepage, The Church Missionary Gleaner The Church Missionary Gleaner. London: Church Missionary Society.

Cohn, B. S. "Representing Authority in British India." In The Invention of Tradition, eds. E. Hobsbawm and T. Rander. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Collet, Sophia Dobson. Letter from Keshab to Sophia Dobson Collet, 10 December 1875. Reprinted in S. D. Collet, ed., The Brahmo Year Book for 1877. London: Williams and Norgate, 1877.
Collet Sophia Dobson, ed. Keshub Chunder Sen's English Visit. London: Strahan and Co., 1871.
Cunningham, Hugh. "The Language of Patriotism 1750–1914." History Workshop Journal 12:1 (1981), pp. 8–33. Daily News Daily News. Datta 2010
Datta, M. N. Sri Sri Ramkrishner Anudhyan. Kolkata: The Mahendra Publishing Committee, 2010.
Deshpande Sharad, ed. Philosophy in Colonia India. New York: Springer, 2015.
Farquhar, J. N. (1915). Modern Religious Movements of India. New York: Macmillan, 1915.
Girardot, N. J. "Max Müller's 'Sacred Books' and the Nineteenth-Century Production of the Comparative Science of Religions." History of Religions 41:3 (2002), pp. 213–50.
Girardot, N. J. The Victorian Translation of China: James Legge's Oriental Pilgrimage. Berkeley: University of California Press, 2002.
Glasgow Herald Glasgow Herald, Glasgow.
Hall, Catherine. Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination 1830–1867. Oxford: Polity, 2002.
Healy, F. "The ruination of Indian economy, the possibility of research funding organization as a focus for science studies." Science Studies Conference, Oxford, 1982.
Heathorn, Stephen. For Home, Country, and Race: Constructing Gender, Class and Englishness in the Elementary School, 1880–1914. Toronto: Toronto University Press, 2000.
Hirschmann, Edwin. "The Hidden Roots of a Great Newspaper: Calcutta's Statesman." Victorian Periodicals Review 37.2 (2004), pp. 141–60.
Hudson, Nicholas. "From 'Nation' to 'Race': The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought." Eighteenth-Century Studies 29:3 (1996), pp. 247–64.
Houghton, W. E. The Victorian Frame of Mind: 1830–1870. New Haven and London: Yale University Press, 1985.
Illustrated Missionary News, London. The Inquirer The Inquirer. London. John Lawrence Collection John Lawrence Collection. India Office Library, MSS.Eur.F.90/31, Letters to Secretary of State, vol.3. No. 58 to Lord Cranborne, Calcutta, 19 December 1866
Kennedy, D. Britain and Empire, 1880–1945. London: Routledge, 2002.
Koditschek, T. Liberalism, Imperialism, and the Historical Imagination: Nineteenth-Century Visions of a Greater Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern India.

Princeton: Princeton University Press, 1979.
Kopf, D. "The Universal Man and the Yellow Dog: The Orientalist Legacy and the Problem of Brahmo Identity in the Bengal Renaissance." In Aspects of Bengali History and Society, ed. R. Van M. Baumer, pp. 43–81. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1975.
Kopf, D. British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization. Berkeley, CA: University of California Press, 1969.
Livingstone, David and Charles Livingstone. Narrative of an Expedition to the Zambezi and Its Tributaries 1858– 1864. London: John Murray, 1865.
Macpherson, G. Life of Lal Behari Day. Edinburgh T. & T. Clarke, 1900.
McClelland, Keith. "Citizenship and Empire, 1867–1928." In At Home with the Empire: Metropolitan Culture and the Imperial World, eds. Catherine Hall and Sonya Rose. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Mehrota, S. The Emergence of the Indian National Congress. Delhi: Vikas Publications, 1971.
Metcalf, T. R. The Aftermath of Revolt: India, 1857–1870. Princeton: Princeton University Press, 1964.
Milic, M. J. "The Sociology of Science in East and West." Current Sociology 28 (1980), pp. 1–342.
Missionary Herald. Journal published by the Baptist Missionary Society.
The Monthly Record.
The Free Church of Scotland.
Mookerjee, Nanda. I Point to India; Selected Writings of Max Mueller. Bombay: Shakuntala Pub. House, 1970.
Mozoomdar, Protap Chunder. Life and Teachings of Keshub Chandra Sen. Calcutta: Baptist Mission Press, 1887. 3rd edition. Calcutta: Nababidhan Trust, 1931.
Müller, F. Max. Auld Lang Syne. New York: Scribners, 1898.
Müller, F. Max, "Physical Religion," Gifford Lecture, Glasgow, 1891.
Müller, F. Max. Biographical Essays. London: Longmans, Green and Co., 1884; rpt. London: Forgotten Books, 2013.
Müller, F. Max. Selected Essays on Language, Mythology, and Religion. London: Longmans, Green & Co., 1881.
Müller, F. Max. On Missions. New York: Scribner, Armstrong and Company, 1874.
Müller, F. Max. A History of Ancient Sanskrit Literature. London: Williams & Norgate; Paris: B. Duprat. Leipzig: R. Hartmann, 1859.
Müller, F. Max and Georgina Adelaide Müller (Grenfell). The life and letters of the Right Honourable Friedrich Max Müller. 2 vols. London, New York: Longmans, Green, 1902.
O'Leary, D. "Raciological Thought in Victorian Culture: A Study in Imperial Dissemination." Doctoral thesis, University of British Columbia,

2000.
Oman, John C. Brahmans, Theists and Muslims of India. London: Fisher Unwin, 1906.
Panikkar, K. M. Asia and Western Dominance. London: George Allen and Unwin, 1961.
Patil, N. B. The Variegated Plumage: Encounters with Indian Philosophy: a Commemoration Volume in Honour of Pandit Jankinath Kaul "Kamal". Delhi: Motilal Banarsidass, 2003.
The Record Supplement, Newspaper, Church of England.
Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
Sarkar, Hem Chandra. The religion of Brahmo Samaj. Sadharan Brahmo Samaj, 1931.
Sastri, Sivanath. History of the Brahmo Samaji, vol. 1. Calcutta: R. Chatterji, 1911.
Sen, A. P. Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905: Some Essays in Interpretation. New Delhi: Oxford University Press, 1993.
Sen, K. C. Keshub Chunder Sen in England: Diary, Sermons, Addresses & Epistles. Navavidhan Publication Committee, 1938.
Sen, K. C. Keshub Chunder Sen's Lectures in India. London and New York: Cassell and Company, 1901.
Sen, K. C. The New Samhita or Sacred Laws of the Aryans of the New Dispensation. 2nd edition. Calcutta: Brahmo Tract Society, 1889.
Sen, K. C. The Brahmo Somaj: Lectures and Tracts, ed. S. D. Collet. London: Strahan & Co., 1870.
Slater, T. E. "Keshab Chandra Sen and The Brahma Samaj." Society for Promoting Christian Knowledge, 1884.
Smith, W. C. "Scripture as Form and Concept: Their Emergence for the Western World." In Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective, ed. M. Levering. New York: State University of New York Press, 1988.
Stevens, J. A. "Colonial Subjectivity: Keshab Chandra Sen in London and Calcutta, 1870–1884." Ph.D. thesis, University College London, 2011.
Symondson, A. The Victorian Crises of Faith. London: SPCK, 1970.
Thakur, M. D. Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore. London; Bombay: Macmillan and Co., 1914.
Thapar, R. "Horseplay in Harappa." Frontline 17:20 (Sep. 30–Oct. 13, 2000).
Thapar, R. (Jan.–Mar. 1996). "The Theory of Aryan Race and India: History and Politics." Social Scientist 24:1/3 (1996), pp. 3–29.
Todd, M. The Early Germans. Oxford: Blackwell Publishing, 1992.
Trautmann, T. R. Aryans and British India. New Delhi: Yoda Press, 2004.
Whewell, William E. History of the Inductive Sciences, from the Earliest to the Present Times. London: John W. Parker; Cambridge: J. and J. J.

Deighton, 1837

বিশেষ উল্লেখ

Subrata Chattopadhyay Banerjee Brahmo Samaj As An Actor In The Dissemination Of Aryan Invasion Theory (Ait) In India, 2016
John Stevens Marriage, Duty and Civilization: Keshab Chandra Sen and the Cuch Bihar, Controversy in Metropolitan and Colonial Context, 2016

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত ৩টে প্রকল্প সমীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোর সামাজিক গুরুত্ব এবং সমস্যা
অন্তত ৮ মাস
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটে প্রকল্প ১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ২। কন্যাশ্রী ৩। সবুজসাথী নিয়ে রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা মধ্য বাংলা আর তরাই বাংলায় বিস্তৃত সমীক্ষা।
কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আশাকরি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে শুরু করতে পারব।

১০। গ্রন্থাগার প্রকল্প
৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

‘হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ’

বিশ্বেন্দু নন্দ

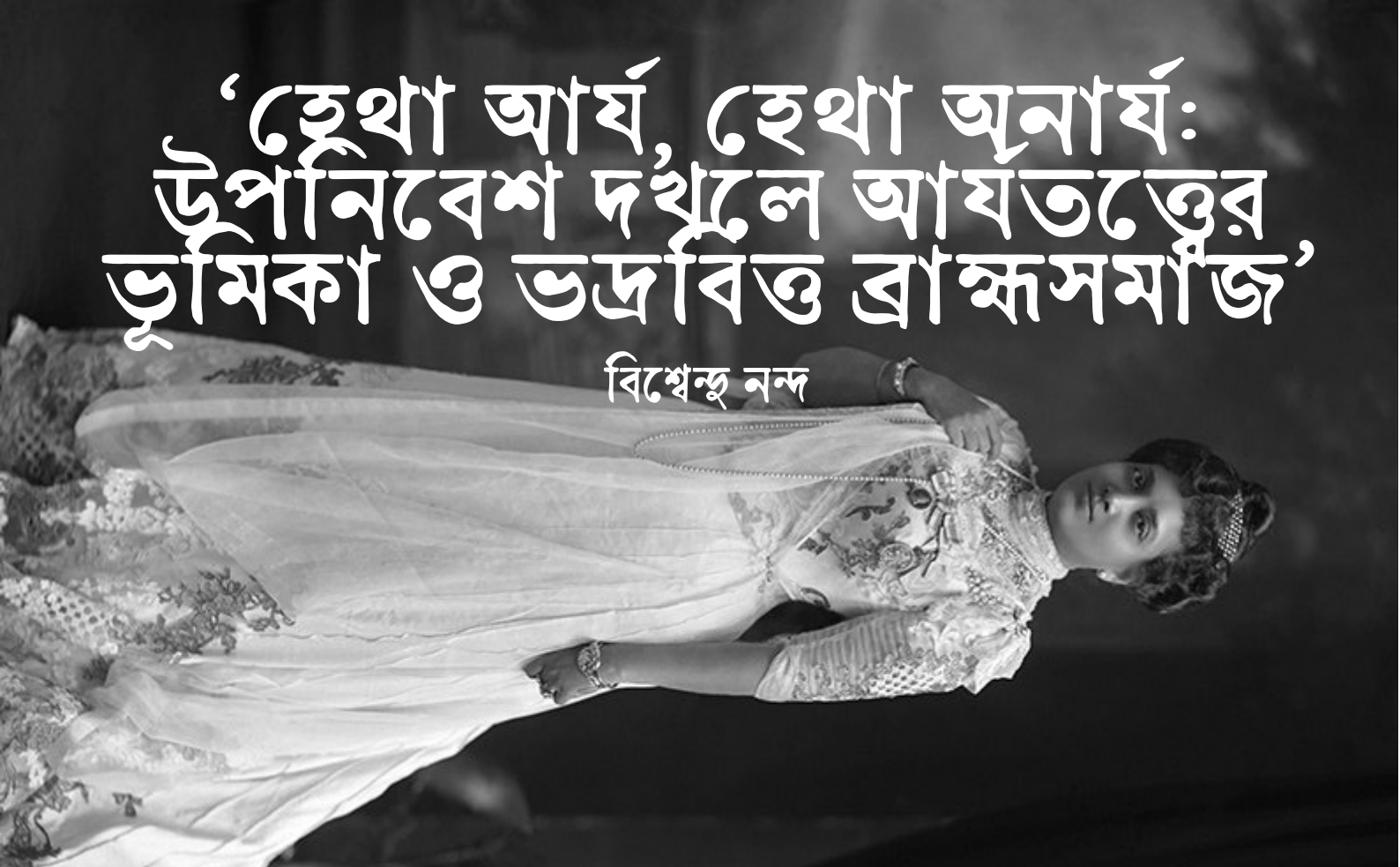

জ্ঞানগঞ্জ

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চাই নি, চেয়েছি চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ আজকের বাস্তবতায়, আজকের আলোচনার টেবলে ফেলতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনা আদিত্য নিগমের সঙ্গে এবং চলতি সংখ্যায় লুঠেরা খুনি গণহত্যাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)'
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ